স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ সেনের জীবনবৃত্তান্ত।

প্রতিকৃতি সহিত।

শ্রীবঙ্কবিহারী কর প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা,
চৈত্র, ১৩২৭ সন।

মূল্য একটাকা মাত্র

প্রাপ্তি স্থান

৫৭ নং, ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা, ৬৬নং মানিকতলা ষ্ট্রীটস্থ
বেঙ্গল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন।

স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ রাজকর্ম্মে—ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেসন জজের পদে নিযুক্ত ছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে বঙ্গদেশে তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। কিন্তু এই জন্যই তাঁহার কথা লিখিত হয় নাই। তিনি ধার্ম্মিক ও সজ্জন ছিলেন। বিদ্যার সঙ্গে বিনয়ের, উচ্চপদের সঙ্গে অমায়িকতা ও অভিমানশূন্যতার এবং জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তি ও কর্ম্মের সম্মিলিত আদর্শজীবন তিনি লাভ করিয়াছিলেন। তত্ত্বদর্শী ভক্ত ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ জীবনের দৃষ্টান্ত তিনি দেখাইয়াছেন। তাঁহার বন্ধুগণের, ধর্ম্মমণ্ডলীর, সমবিশ্বাসী ও সমভাবাপন্ন সকলের মধ্যে এজন্য তাঁহার একটি বিশেষ স্থান ছিল।

উচ্চ পদলাভে কি জ্ঞানালোচনা করিয়া অনেকে ধর্ম্মে উদাসীন হন। পদগৌরব অথবা তর্ক, বিচার ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শনই তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু ধার্ম্মিক জন বলেন—"কি হবে সে জ্ঞানে যাতে তোমারে না পাই।" জ্ঞান যদি ধর্ম্মকে প্রদর্শন না করে, ধর্ম্মাবহ ঈশ্বর লাভের সহায় না হয়, ধার্ম্মিকের বিবেচনায় সে জ্ঞান বৃথা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ এম, এ, উপাধি এবং বিলাতের বিদ্যা অম্বিকাচরণের সংসারক্ষেত্রের সুযোগের সহায় হইয়াছিল, কিন্তু উহা তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে নাই। তাঁহার লক্ষ্য ছিল ধর্ম্মজীবন,

আদর্শ ব্রাহ্মজীবন। তিনি জ্ঞানের পথ দিয়া ধর্ম্মের গৃহে উপনীত হইয়াছিলেন—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সাধন করিয়া আদর্শ ব্রাহ্ম-জীবন লাভ করিয়াছিলেন।

যে জ্ঞান ব্রহ্মকে প্রদর্শন করে সেই জ্ঞানের আলোচনাই অম্বিকাচরণের লক্ষ্যস্থলে ছিল। বেদ, উপনিষদ, বৌদ্ধ শাস্ত্রানুশীলন তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানেরই স্ফূর্ত্তি বিধান করিয়াছিল।

শেষ জীবনে তিনি প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত বেদ ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার গবেষণার ফল গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবেন এমন ইচ্ছাও তাঁহার ছিল। কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। প্রবন্ধাকারে যাহা কিছু মুদ্রিত হইয়াছিল তদ্দ্বারা সুধীগণ তাঁহার চিন্তার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছিলেন। সমগ্র ভাব ও চিন্তা গ্রন্থবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইলে তদ্দ্বারা দেশের উপকার হইত।

বুদ্ধ নিরীশ্বর, শিক্ষিত লোকের মধ্যে কেহ কেহ এমন বিশ্বাস করেন। অম্বিকাচরণের নিকট ইহার ভ্রান্তি ধরা পড়িয়াছিল বক্তৃতা, আলোচনা, প্রবন্ধাদি দ্বারা তিনি ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন :—বুদ্ধ নিরীশ্বর নহেন, কিন্তু গভীর তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রচারক।

যে পূর্ণাঙ্গধর্ম্ম বর্ত্তমান যুগের আদর্শ তাহা সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের বার্ত্তা প্রচার করিয়াছে। অম্বিকাচরণ ভারতীয় বৈদিকশাস্ত্র আলোচনা কালে সমন্বয় দৃষ্টিবলে দেখিয়াছিলেন ভারতীয় ধর্ম্মধারা-সকলের গতি একই ঈশ্বরের দিকে। প্রাচীন হিন্দুর প্রকৃতি-

পূজা, শক্তিপূজা, ধীরে ধীরে এক মহান পরমেশ্বরের পূজার মন্দিরেই আসিয়া উপনীত হইয়াছে। বৈদিক ঋষির উষার বর্ণনার মধ্যে, ইন্দ্র, বরুণের স্তোত্রের মধ্যেও অম্বিকাচরণ বিরাট ব্রহ্মের পূজার আভাসই পাইয়াছিলেন। এজন্য যখন ঐ সকল পাঠ করিতেন, ভাবে মুগ্ধ হইতেন, তাঁহার মুখমণ্ডলে জ্যোতি স্ফুরিত হইত।

তিনি পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ ও ভক্ত লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ক্ষুদ্র জীবনী লেখকের সকলদিকেই অভাব। সুতরাং অম্বিকাচরণের সম্পূর্ণ পরিচয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে কেহ আশা না করেন। তাঁহার ছাত্রজীবন, কর্ম্মক্ষেত্র, পারিবারিক ও ধর্ম্মজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সহজ কথায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পাঠকগণ গ্রন্থকারের অক্ষমতাজনিত অসম্পূর্ণতা মার্জ্জনা করিবেন।

পেন্সনপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট গিরিডি প্রবাসী শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ মহাশয় স্বর্গীয় সেন মহাশয়ের কৃষিবিষয়ক অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গে যাহা যাহা লিখিয়াছেন তাহা অত্যন্ত মূল্যবান। তাঁহাকে এই সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি

হাজারীবাগ প্রবাসী সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ বি, এ, মহাশয় সেনমহাশয়ের বেদ ও বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহাও অত্যন্ত মূল্যবান। কৃতজ্ঞতার সহিত মহেশবাবুর সহায়তা স্বীকার করিতেছি।

কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেছি এই গ্রন্থ সঙ্কলনে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। সেনমহাশয়ের জামাতা শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র রায় ব্যারিষ্টার মহাশয় গ্রন্থের সংশোধন ও অসম্পূর্ণতা দূর করিবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছেন।

স্বর্গীয় অশ্বিকাচরণের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা সুদক্ষিণা সেন মহাশয়ার নাম এই গ্রন্থের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ তাঁহার আগ্রহ, যত্ন, ও আনুকূল্যেই ইহার সংকলন ও মুদ্রণ সম্ভব হইয়াছে। সহধর্ম্মিণীরূপে স্বামীর সঙ্গে তাঁহার যে নিগূঢ় সম্পর্ক তাহার পরিচয় রূপে তাঁহার কয়েকটি শ্রাদ্ধবাসরের প্রার্থনা গ্রন্থের শেষে সংযোজিত হইল।

গ্রন্থকার।

সূচী।

পৃষ্ঠা।



স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ সেন

স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ সেনের জীবন বৃত্তান্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বাল্য জীবন।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত মানিকগঞ্জ মহকুমার মত্ত গ্রামে এক প্রসিদ্ধ বৈদ্যবংশে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর অম্বিকাচরণের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম গঙ্গাপ্রসাদ সেন। গঙ্গাপ্রসাদ কুমিল্লা সহরে সরকারী কর্ম্ম করিতেন, এবং দেশে ও কর্ম্মস্থলে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

অম্বিকাচরণ পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান। প্রথম পুত্রের জন্মের বহুদিন পরে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। এজন্য তিনি পিতামাতার অতি আদরের পাত্র ছিলেন। তাঁহার সুকুমার শিশু-দেহে এমন একটি লাবণ্য ও শ্রী ছিল যাহাতে সহজেই পরিচিত অপরিচিত সকলেরই স্নেহ আকৃষ্ট হইত। কুমিল্লায় একদিন ভৃত্যসঙ্গে রাজ পথে বেড়াইতে গিয়া বালক অম্বিকাচরণ তথাকার জজ সাহেবের পত্নীর বিশেষ আদর লাভ করিয়াছিলেন। জজ সাহেবের পত্নী গাড়ী করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন; এবং

শিশুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া গাড়ী থামাইয়া অনেক আদর করিয়া দশটি টাকা দিয়াছিলেন।

শিশুকাল হইতে অনেকের এমন আদর পাইয়াও তাঁহার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয় নাই। শৈশবকাল হইতেই তিনি অতিশয় নম্র ও শান্ত স্বভাবের ছিলেন, এবং এই স্বভাব চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল।

পিতা গঙ্গাপ্রসাদ অধিক দিন কুমিল্লা সহরে কর্ম্ম করিতে পারেন নাই। মস্তিষ্কের পীড়া হওয়ায় কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, এবং সপরিবারে মন্ত গ্রামে আপন বসত বাটীতে বাস করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহার পর তিনি অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। চারি পাঁচটি শিশু সন্তান ও পত্নী শিবসুন্দরীকে অকূলে ফেলিয়া পরলোক গমন করেন।

বিপদে ধৈর্য্যই মানুষের বল। ধৈর্য্যের সহিত বুদ্ধি বিবেচনা থাকিলে মানুষের বিপদ বেশীক্ষণ থাকে না। শিবসুন্দরী অতি বুদ্ধিমতী ও সহৃদয়া নারী ছিলেন। তদুপরি তাঁহার অত্যন্ত সন্তান-বাৎসল্য ছিল। এই বাৎসল্য নারী-হৃদয়ের একটি শক্তি; এই শক্তির সাহায্যে নারী অনেক সময় অসাধ্য সাধন করিয়া থাকেন। শিবসুন্দরী সন্তানগণের দিকে চাহিয়া স্বামী-শোক ভুলিয়াছিলেন। তিনি পুত্র দুইটির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া আপনাকে সামলাইয়া লইয়া, পুত্রগণের উপযুক্ত শিক্ষায় মন দিয়াছিলেন। তাঁহাদের কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল। শিবসুন্দরী তদ্দারা সন্তানগণের ভরণ পোষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তারিণীচরণ তখন গ্রামের শিক্ষা শেষ করিয়া ঢাকা সহরে পড়িতেছিলেন। অম্বিকাচরণ গ্রাম্য বিদ্যালয়ে ছিলেন। নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় তারিণীচরণের কলেজের একজন সহাধ্যায়ী ও বন্ধু। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত বন্ধুতা ছিল। বঙ্গবাবু তারিণীচরণ ও অম্বিকাচরণের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

"তারিণীচরণের সঙ্গে আমার অত্যন্ত ভালবাসা ছিল। তখনকার দিনে সমপাঠীদের মধ্যে যেমন ভালবাসা দেখিতাম এখন তেমন দেখি না। আমার বন্ধু গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের মতের গৃহে আমি যখনই যাইতাম তারিণীর আকর্ষণে তাঁহার গৃহেও না গিয়া পারিতাম না। তারিণীর মা আমাকে সন্তানতুল্য ভালবাসিতেন। আমি অনেক সময় আব্দার করিয়া তাঁহার নিকট হইতে লাড়ু খাইতাম। তিনি প্রসন্ন মনে আমার আব্দার পূর্ণ করিতেন।"

"আমরা বড়রা খেলিতাম, বালক অম্বিকাচরণ আমাদের খেলায় সহায়তা করিতেন। বালকের সরল মিষ্ট প্রকৃতি ও মধুর ব্যবহারে তাঁহার প্রতি আমার অকৃত্রিম ভালবাসা জন্মিয়াছিল। কেবল আমার নয়, অম্বিকাচরণের প্রতি সকলেরই ভালবাসা দেখিতাম। মধুর প্রকৃতি তাঁহাকে সকলের প্রিয়পাত্র করিয়াছিল। উহাতে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস পাইয়াছিলাম।"

"বাল্যকাল হইতে যেমন স্বভাব চরিত্রে তেমনি পড়াশুনায়ও

তিনি অতুলনীয় ছিলেন। আদর্শ-চরিত্র বালক বলিলে যাহা বুঝায় তিনি তাহাই ছিলেন। তাঁহাদের দুইটি ভাইর মধ্যে অত্যন্ত ভালবাসা ছিল। তারিণীর সঙ্গে বন্ধুতায় অম্বিকাচরণের প্রতি আমারও কনিষ্ঠতুল্য স্নেহ জন্মিয়াছিল। আর তিনিও আমাকে জ্যেষ্ঠতুল্য শ্রদ্ধা করিতেন।”

অম্বিকাচরণের প্রকৃতি অন্যান্য বালক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। সমবয়সী বালকদের সঙ্গে তিনি খেলিতেন বটে, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে তাঁহার প্রকৃতির প্রভেদ সহজেই প্রতীয়মান হইত; যেন তিনি সে দলের নহেন। তাঁহার সহাস্য বদন, গম্ভীর মূর্ত্তি সকলেরই ভালবাসা আকর্ষণ করিত; তাঁহার মুখ দেখিলে ভালবাসিতে ইচ্ছা হইত। এজন্য তিনি সমবয়সী ও বয়োজ্যেষ্ঠদের সকলেরই প্রিয় ছিলেন। তাঁহার স্বভাব এমন নির্ম্মল ছিল যে কাহারও মুখে তাঁহার নিন্দা শুনিতে পাওয়া যাইত না।

অম্বিকাচরণের বাল্য বন্ধু শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—“অম্বিকাচরণ বাল্যকাল হইতে অল্পভাষী ও নির্ম্মল-চরিত্র ছিলেন। গ্রামে তখন যদিও অশ্লীলতার প্রভাব ছিল এবং অনেক বালক কুকথার ব্যবহার করিত তথাপি উহা অম্বিকাচরণকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। কারণ তিনি কখনও এই সমস্ত বালকের সঙ্গে মিশিতেন না। নিজের মনে নিজের বাড়ীতে একাকী, কখনও বা সমবয়স্ক জ্ঞাতি ভ্রাতাদের সঙ্গে খেলিতেন। সুতরাং আজীবন চিত্তকে বিশুদ্ধ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।”

তারিণীচরণ এফ্‌ এ পর্য্যন্ত পড়িয়া কলেজ ত্যাগ ও

সংসারের সহায়তার জন্য শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। তিনি অতি সচ্চরিত্র ও স্নেহশীল ভ্রাতা ছিলেন। কনিষ্ঠের শিক্ষার প্রতি তাঁহার একান্ত যত্ন ছিল। তাঁহাদের দুইটি ভ্রাতার ভালবাসা ও ব্যবহার দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হইত, আর রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে তুলনা করিত।

আত্মসম্মান-বোধ এবং স্বাধীনতা-প্রিয়তা মানব-চরিত্রের একটি প্রধান বল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্য দিয়া বাল্যকাল হইতে অম্বিকাচরণের চরিত্রে ইহার বিকাশ দেখা গিয়াছে। এ সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

একবার প্রতিবেশী কোন ব্যক্তি বালক অম্বিকাচরণকে তামাসা করিয়া বলিয়াছিল,"তুমিত দাদার অন্নে প্রতিপালিত, এবং দাদার উপরই তোমার নির্ভর।" দাদার প্রতি অত্যন্ত ভালবাসা সত্বেও এ কথায় তাঁহার আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগিল। তিনি দুঃখে অভিমানে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। এবং পরনের ধুতিখানা ফেলিয়া দিয়া গ্রামের সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক শ্মশানঘাটে উপস্থিত হইয়া একখানা জীর্ণ বস্ত্র পরিয়া আপনাকে স্বাধীন মনে করিলেন, এবং অভিমানে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। বলা বাহুল্য, তদবধি তামাসা করিয়াও কেহ তাঁহার আত্মমর্য্যাদায় আঘাত দিত না।

মস্তগ্রামে তখন কোন ভাল বিদ্যালয় ছিল না। এজন্য মাতা শিবসুন্দরী অম্বিকাচরণকে আট বৎসর বয়সেই ধামরাই স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। সন্তানের সুশিক্ষার প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁহাদের জ্ঞাতি ঈশ্বরচন্দ্র সেন

(ইনি লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের পিতা) ধামরাই স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ছিলেন। অম্বিকাচরণ ইঁহার গৃহে থাকিয়া কিছুকাল পড়াশুনা করেন। মনোযোগ এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দুইই তাঁহার ছিল। ইহাতে ধামরাই স্কুলে তিনি একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তথায় পূজনীয়দের আদর, সমবয়সীদের ভালবাসা এবং শিক্ষকের স্নেহ সকলই তিনি পাইয়াছিলেন।

ধামরাই যাওয়ার পূর্ব্বে বালক অম্বিকাচরণ আর কখনও মাকে ছাড়িয়া থাকেন নাই। মার জন্য তাঁহার খুব কষ্ট হইত। মাকে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেন না। সময় সময় মার অভাবে তাঁর কোমল প্রাণ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িত। এজন্য তিনি গ্রামের বিগ্রহ মাধবের মন্দিরে গিয়া প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার দুঃখ দূর হয় নাই। ক্রমে মাধবের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস শিথিল হইয়া যায়। অবশেষে দেবতার শক্তি আছে কিনা ইহা পরীক্ষার জন্য তিনি একদিন বিগ্রহের দিকে পা রাখিয়া বলিয়াছিলেন, "এই আমি তোমাকে অগ্রাহ্য করিতেছি, যদি তুমি ঈশ্বর হও আমার অনিষ্ট কর।" কিন্তু দেবতার কোন পরিবর্ত্তন না হওয়ায় তাঁহার মনে হইয়াছিল, ইষ্টানিষ্টের কোন ক্ষমতা এই দেবতার নাই। এই সিদ্ধান্ত করিয়া বালক গ্রামের প্রান্তরে চীৎকার করিয়া অদৃশ্য দেবতাকে অনেক ডাকিয়াছিলেন, অনেক কাঁদিয়াছিলেন। এইরূপ করিয়া তাঁহার মনে সান্ত্বনা জন্মিয়াছিল। এবং হয়ত এইরূপে নিরাকার ঈশ্বরের ভাবও তাঁহার মনে প্রবেশ করিয়াছিল।

অম্বিকাচরণ ধামরাই গ্রামে দারুণ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার জীবনের আশা প্রায় ছিল না। অজ্ঞান অবস্থায় তাঁহাকে গৃহে আনা হইয়াছিল। জননীর ও জ্যেষ্ঠতাত-পত্নীর অক্লান্ত সেবায় এবং একজন সুদক্ষ বসন্ত চিকিৎসকের গুণে তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। অম্বিকাচরণকে দারুণ সঙ্কটজনক ব্যাধি হইতে মুক্ত করিয়া ঈশ্বর যেন আমাদিগকে ইহাই বুঝিতে দিয়াছেন, যে অম্বিকাচরণের জীবনে তাঁহার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথেই তিনি তাঁহাকে লইয়া যাইতেছিলেন।

ঢাকায় শিক্ষা।

অম্বিকাচরণ ধামরাই স্কুল হইতে প্রশংসার সহিত মধ্য-ইংরেজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একটি বৃত্তি লাভ করেন এবং ঢাকার কলেজিয়েট স্কুলে প্রবেশ করেন। যে বৎসর তিনি কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন, ঐ বৎসর স্বর্গীয় কেদারনাথ রায় মহাশয়ও ঢাকার পোগোজ স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। তিনিও মধ্য-ইংরেজী পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছিলেন। বুদ্ধিমত্তাগুণে ঢাকার স্কুলে অল্পদিন মধ্যে তাঁহাদের উভয়েরই বেশ সুনাম হইয়াছিল।

অম্বিকাচরণ কলেজিয়েট স্কুলে চারি বৎসর অধ্যয়ন করেন। ১৮৬৭ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ১৪৲ টাকার একটি বৃত্তি প্রাপ্ত হন, এবং ঢাকা কলেজে প্রবেশ করেন।

সঙ্গ-সভার সঙ্গে যোগ।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই তিনি ব্রাহ্ম-যুবকগণের পরিচালিত সঙ্গত সভার সভ্য হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত পূর্ব্বাবধি তাঁহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। বঙ্গবাবু পোগোজ স্কুলের শিক্ষক এবং ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মে ব্রতী ছিলেন। অম্বিকাচরণ তাঁহার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গত সভায় ও তাঁহাদের উপাসনায় যোগ দিতে আরম্ভ করেন।

ঢাকাকলেজে অধ্যয়ন কালেই অম্বিকাচরণ যৌবনে পদার্পণ করেন। যৌবনের উৎসাহ, উদ্যম ও উন্নত আকাঙ্ক্ষা তখন তাঁহার মনে প্রবল। এই সময় ঢাকাকলেজের একদল যুবক শিক্ষোন্নতির সঙ্গে নৈতিক ও ধর্ম্মোন্নতি সাধনে তৎপর হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন, ৺রজনীকান্ত ঘোষ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায়, ৺সারদাকান্ত হালদার, ৺রজনীনাথ রায়, ৺অম্বিকাচরণ সেন, ৺বরদানাথ হালদার প্রভৃতিকে অগ্রণী বলা যায়। ঢাকার সঙ্গত সভা এই সকল উন্নত-চরিত্র শিক্ষিত যুবকগণের সম্মিলন-স্থল ছিল।

শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায়, ভুবনমোহন সেন প্রভৃতি ঢাকার সঙ্গত সভার আদি সভ্য। কেদারনাথ, অম্বিকাচরণ প্রভৃতি অন্যান্য সহযোগীগণ পরে আসিয়া একত্র হন। অম্বিকাচরণ চিরদিনই

ধীর ও নীরব প্রকৃতির লোক ছিলেন। এজন্য তাঁহাকে প্রায় সম্মুখবর্ত্তী হইতে দেখা যাইত না। কিন্তু তিনি অত্যন্ত অনুরাগী ও সত্ত্বগুণ-প্রধান ছিলেন। উপাসনা, আলোচনাদিতে তাঁহার এরূপ নিষ্ঠা ছিল, যে তদ্দ্বারা তাঁহার স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বদা প্রতীয়মান হইত।

অম্বিকাচরণ দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সেন, পূর্ণচন্দ্র সেন, তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির সহিত একত্র মেসে বাস করিতেন। তাঁহারা বালিয়াটির জমিদার জগন্নাথ বাবুর, বাবুরবাজারের তেতালা বাড়ীতে একটি মেস করিয়াছিলেন। ভূতের বাড়ী বলিয়া এই বাড়ী কেহ ভাড়া লইত না। এজন্য ঐ বাড়ী তাঁহারা অল্প ভাড়ায় পাইয়াছিলেন। এখানে তাঁহাদের পড়াশুনা, আলোচনা, উপাসনা, স্বাধীনভাবে ও আনন্দে নির্ব্বাহ হইত।

গ্রীষ্মাবকাশের পর এই মেস স্বর্গীয় নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পৈত্রিক বাড়ীর এক অংশে উঠিয়া যায়। তথায় নবকান্ত ও সারদাকান্তের সহিত তাঁহাদের অকৃত্রিম বন্ধুতা জন্মে। ইতিমধ্যে উপবীতত্যাগ লইয়া চট্টোপাধ্যায় পরিবারে আন্দোলন উপস্থিত হইলে তাঁহারা গৃহ হইতে তাড়িত হন, ও তাঁহাদের মেস ভাঙ্গিয়া যায়। যে বয়সে যুবকেরা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পিতামাতার ক্লেশের কারণ হয়, সেই বয়সে ইঁহারা ধর্ম্মপথে, সত্য ও সংস্কারের পথে পদক্ষেপ করিয়া অভিভাবকগণের বিরাগভাজন হইলেন। মানুষের বিরাগ সন্তোষ এমনই যে-কোন একটি সূত্র অবলম্বন করিয়া জন্মিয়া থাকে।

যুবকগণের বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় কর্ম্মক্ষেত্রেও অগ্রণী ছিলেন। মূল সঙ্গত সভায় সকলকে লইয়া তিনিই ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত উপাসনা ও আলোচনাদি করিতেন। তিনি বলিয়াছেন—"অম্বিকাচরণের নিষ্ঠা ও অনুরাগ আমার শ্রদ্ধা-সমন্বিত প্রীতি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল।"

সঙ্গত সভার তখনকার বিবরণ শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায়, ভুবনমোহন সেন, ৺রজনীকান্ত ঘোষ ইঁহাদের-সকলের নিকটই শুনিয়াছি। শুনিয়া বুঝিয়াছি, নব-ধর্ম্মের সেই প্রবল উদ্যমের সময় যুবকগণ ধর্ম্মবুদ্ধিতে এমন মাতিয়া ছিলেন যে কোন বাধাকে তাঁহারা বাধা জ্ঞান করিতেন না। পৃথিবীর সুখ, স্বার্থ, তাঁহারা তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। সংস্কারের বন্ধন, যাহা সমাজের বুকে দৃঢ়বদ্ধ ছিল উৎসাহ বলে এক নিমেষে তাহা মোচন করিবার শক্তি তাঁহারা পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই উৎসাহানলে সঙ্গত স[illegible] ইন্ধন যোগাইত। তথায় যাহা আলোচিত হইত যুবকগ[illegible] জীবন তদনুসারে গঠিত হইত। যাঁহারা আলোচনার অ[illegible]। জীবন যাপনে অসমর্থ হইতেন, আলোচনা-ক্ষেত্রে অনুতাপের অশ্রুতে তাঁহাদের বুক ভাসিয়া যাইত। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, সঙ্গতসভার সাপ্তাহিক লিপি পাঠে অনেক সময় কান্নার রোল উঠিত। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত আলোচনা চলিলেও গৃহে গিয়া আহার নিদ্রার জন্য কাহারও তাগিদ দেখা যাইত না। ব্যক্তি বিশেষের কথা শুনিয়া যে এইরূপ ধর্ম্মোৎসাহ যুবকগণের মনে জন্মিয়াছিল তাহা নয়। ধর্ম্মাবহ ঈশ্বর স্বয়ং এই

ভাব-তরঙ্গের নিয়ন্তা। পরে অম্বিকাচরণের মুখে অনেক বার শোনা গিয়াছে, যে এই সময়ে এই তরঙ্গ অনেক, এমন কি গ্রামবাসী নরনারীকে ভগবানের দিকে উন্মুখ করিয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মের বার্ত্তা যখন ইঁহাদের নিকট উপস্থিত হইল, তখন অতি সহজেই এই ধর্ম্মকে ইঁহারা আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইলেন। ধর্ম্মের জন্য এই প্রকার উৎসাহী যুবকগণের অন্যতম অম্বিকাচরণ নীরবে নিষ্ঠার সহিত আপনার ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতেছিলেন।

জাতিভেদ বর্জ্জন।

ব্রাহ্মসমাজের সংশ্রবে আসিয়া তাঁহার মনে ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব বিশেষ ভাবে জাগ্রত হইয়াছিল। এজন্য জাতিভেদ অবশ্য বর্জ্জনীয় জ্ঞান করিলেন। কিন্তু মাতা এবং আত্মীয় স্বজন ইহার অন্তরায় ছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, অম্বিকা চরণের প্রগাঢ় মাতৃভক্তি তাঁহাকে সকল প্রকার অহিন্দু আচার হইতে রক্ষা করিবে। অতি কোমল ও নীরব স্বভাবের অন্তরালে অম্বিকাচরণের যে কঠোর সত্যনিষ্ঠা জাগ্রত ছিল তাহা বুঝি তাঁহারা তখনও বুঝিতে পারেন নাই। যাহা নয় পাছে তাহা লোকে মনে করে এজন্য অম্বিকাচরণ তাঁহার বন্ধু পূর্ণচন্দ্র সেন ও বিহারীলাল সেনের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, যে প্রকাশ্যে জাতিভেদ নষ্ট করিতে হইবে।

ইতিমধ্যে একবার তাঁহাকে গৃহে গমন করিতে হইল। তখন একজন প্রতিবেশী আসিয়া তাঁহার মাতাকে বলিলেন, আপনার পুত্র বিধর্ম্মী হইয়াছে; সে জাতি মানে না। মাতা উত্তর করিলেন—"তাহা কখনও হইতে পারে না, আমার অম্বিকা যার তার হাতে খায় না।" তিনি জানিতেন, তাঁর অম্বিকা কখনও অবাধ্য সন্তান নয়। কিন্তু নির্ভীক অম্বিকা তাঁহার মাতার মনে কষ্ট দিয়াও সত্যকে রক্ষা করিলেন। সেই দিন তিনি সকলের সাক্ষাতে বাড়ীর পুরাতন মুসলমান ভৃত্যকে স্পর্শ করিয়া এক মুষ্টি অন্ন মুখে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, দেখ আমি কার্য্যতঃই জাতিভেদ মানি না। ইহার ফলে তিনি তখনই জাতিচ্যুত হইলেন। এবং [illegible]দের মুখে তাঁহার কত প্রশংসা ছিল তাহারাই তাঁহার [illegible] করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, মার মনে আঘাত দিয়া [illegible]ও অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, এবং ঈশ্বরচরণে ব্যাকুল ভাবে এই প্রার্থনা করিলেন—"হে ঈশ্বর আমার মার মনে শান্তি দাও, তিনি যেন আমার জন্য ক্লেশ ভোগ না করেন।"

ধর্ম্মনিষ্ঠা।

অম্বিকাচরণ সঙ্গত সভার আলোচনা, ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা ও ব্যক্তিগত দৈনিক নির্জ্জন উপাসনায় অত্যন্ত নিষ্ঠাপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু তবু অধ্যয়নের প্রতি তাঁহার কিছু মাত্র অবহেলা ছিল না। অধ্যয়নকে ছাত্রজীবনের তপস্যা জ্ঞান করিতেন। এবং এই তপস্যায় তিনি পূর্ণ মনোযোগী ছিলেন। আমরা শুনিয়াছি,

তিনি ঈশ্বর স্মরণ ও ঈশ্বরে বিশেষভাবে মনোনিবেশ না করিয়া পড়া আরম্ভ করিতেন না, এবং এমন কি, অনেক সময় উপাসনা প্রার্থনায় তাঁহার অনেক রাত্রি অতিবাহিত হইত। আশ্চর্য্যের বিষয়, তবু তাঁহার পরীক্ষার ফল মন্দ হইতে পারে নাই। কর্ত্তব্য কর্ম্মে অনলসতাই ইহার কারণ। এতদ্ব্যতীত তাহার বুদ্ধিরও প্রখরতা ছিল।

তৎকালের ধর্ম্মবন্ধুগণের মধ্যে গভীর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। অনেকের মুখে শুনিয়াছি, একের জন্য অপরে স্বেচ্ছায় ক্লেশ স্বীকার করিতেন। অম্বিকাচরণ বলিয়াছেন—তিনি 'পড়িতে পড়িতে শ্রান্ত হইয়া হয়তো একখানা অভিধান মাথায় দিয়া ঘুমাইয়া পড়িলে জ্যেষ্ঠতুল্য বঙ্গচন্দ্র তাঁহাকে বাতাস করিয়া মশার কামড় হইতে রক্ষা করিতেন।' তাঁহাদের সেই প্রীতি ও আধ্যাত্মিক যোগের কখনও বিরাম হয় নাই।

ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ।

ব্রাহ্মসমাজের সেই সুসময়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় বঙ্গদেশের শিক্ষিত মণ্ডলীতে এক নব-উদ্দীপনার সূচনা হইয়াছিল। তখন কলিকাতার যে একদল শিক্ষিত যুবক কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণবিহারী সেন প্রভৃতি সেই দলে ছিলেন। যেমন কলিকাতায় তেমনি ঢাকায়ও একদল শিক্ষিত যুবক ব্রহ্মানন্দের নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন। অম্বিকাচরণ এবং তাঁহার সঙ্গত সভার বন্ধুগণ এই দলে ছিলেন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইলে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁহার সহযোগী কান্তিচন্দ্র ও ত্রৈলোক্যনাথকে সঙ্গে লইয়া ঢাকায় গমন করেন। আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ পূর্ব্বাবধি তথায় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন সর্ব্বত্যাগী এই সকল মহাত্মার সম্মিলনে ঢাকায় এক স্বর্গীয় উদ্দীপনার উদয় হইয়াছিল। মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন নগর-সংকীর্ত্তনে —"তোরা আয়রে ভাই এত দিনে দুঃখের নিশি হ'ল অবসান নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম—" ধ্বনিতে সহরের লোক মাতিয়া উঠিয়াছিল। কীর্ত্তনের দল সহর প্রদক্ষিণ করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলে ধরাতলে স্বর্গের দৃশ্য দেখিবার জন্য দলে দলে লোক একত্র হইয়াছিল। ঢাকার প্রসিদ্ধ নবাব গণিমিঞা এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সম্ভ্রমের সহিত উপস্থিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মগণের প্রায় সকলেই এই দিন ব্রহ্মানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত [illegible] প্যারীমোহন, গঙ্গাগোবিন্দ এবং ভৃত্য মদনকে লইয়া ব্র[illegible]র্ম্মে প্রবেশ করেন।

সে সময়ের স্রোতের মধ্যে যাঁহারা আপনাদিগকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তাঁহাদের সঙ্গে কথা বলিয়া বুঝিয়াছি, সে স্রোত দেশের পাপ তাপ ধৌত করিতে আসিয়াছিল। ধর্ম্মের জন্য ত্যাগ স্বীকারের আশ্চর্য্য দৃষ্টান্তসকল মনে করিলেও আমাদের হৃদয় গৌরবে স্ফীত হয়। সে সময়ে অনেক যুবক-ব্রাহ্ম, সত্যের অনুসরণ করিতে গিয়া পৈতৃক সম্পত্তি

হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, জাতি-চ্যুত হইয়া লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, প্রেমময়কে পাইতে গিয়া প্রিয়জনদিগকে হারাইয়াছেন, তবু তাঁহাদের উৎসাহের কিছুমাত্র লাঘব বা প্রসন্নতার হানি হয় নাই।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—"আচার্য্য কেশবচন্দ্র একবার প্রায় একমাস কাল ঢাকায় অবস্থান করিয়া তাঁহার প্রেমাস্পদ যুবকদলের ধর্ম্মোন্নতি সাধনে সহায়তা করিয়াছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সঙ্কীর্ত্তন ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গ হইত। আচার্য্যের আলোচনায় যুবকদের মনে ব্রহ্মদর্শন ও শ্রবণ পরিষ্কার মুদ্রিত হইত। ব্রহ্মদর্শন ব্যতীত উপাসনা খাটি হয় না, উপাসনা খাটি না হইলে জীবনের যথার্থ পরিবর্ত্তন অসম্ভব, ইহা অনুভব করিয়া যুবকগণ ব্রহ্মদর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। অম্বিকাচরণ এই ব্রহ্মদর্শনমূলক উপাসনায় দৃঢ়-নিষ্ঠ ছিলেন। সন্ধ্যার উপাসনাতে যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মানুভূতি না হইত সে পর্য্যন্ত তিনি পড়া আরম্ভ করিতেন না।"

কলিকাতায় গমন।

অম্বিকাচরণ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এফ্, এ, পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া একটি বৃত্তি লাভ করেন। পরে ১৮৭১ সনে বি, এ, উপাধি প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতায় গমন করেন। তথায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইয়া ১৮৭৩ সনে রসায়ন শাস্ত্রে এম, এ পাশ করেন।

তখন কলিকাতায় শিয়ালদহের নিকটবর্ত্তী ৩৩নং মুসলমান পাড়া লেনে পূর্ব্ব বাঙ্গালার ব্রাহ্ম ছাত্রগণের একটি মেস ছিল। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত, অম্বিকাচরণ, রজনীনাথ রায় ইঁহারা সকলে এখানে থাকিয়া এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বিক্রমপুরের কুকুটিয়া গ্রামের কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীও তাঁহাদের সঙ্গে থাকিতেন। তিনি পৈতা ফেলিয়া ব্রাহ্ম হইয়া ছিলেন। পত্নীকে ব্রাহ্মসমাজে আনিবার সুবিধা হইবে মনে করিয়া তিনি সুদূর আসামে চাকুরী করিতে গিয়াছিলেন। তথায় দারুণ ওলা-উঠায় প্রাণত্যাগ করেন। অম্বিকাচরণের সঙ্গে কালীপ্রসন্ন বাবুর অত্যন্ত ভালবাসা ছিল। মশার কামড়ে অস্থির হইয়া গ্রীষ্মকালেও উভয়ে একটি লেপ গায় দিয়া রজনী যাপন করিতেন।

ইতি মধ্যে ঢাকার মাঝপাড়া গ্রামের একটী ব্রাহ্মণ পরিবার নূতন ব্রাহ্মপরিবার ভুক্ত হইয়া কলিকাতায় আসেন ও মুসলমান পাড়ার নিকটবর্ত্তী ওলড বৈঠক খানা রোডে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই পরিবারের জননী স্বর্গীয়া নিত্যকালী দেবী ব্রাহ্মণ কুলীন বধূ। কৌলিন্যের গ্রাস হইতে কন্যাগণের উদ্ধারের জন্য পুত্র, পুত্রবধূ, এবং দুইটি কন্যা লইয়া তাঁহার মাসতুত ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। এই পরিবার সোহাগদল পরিবার বলিয়া পরিচিত ছিল। সোহাগদল নিত্যকালী দেবীর পিত্রালয় ছিল। নিত্যকালী দেবীর স্বামী তাঁহার শেষ ইচ্ছা—কন্যাগণের

শিক্ষা ও বড় করিয়া বিবাহ দিবার ইচ্ছা—পত্নীর মনেও জন্মাইয়া দিয়াছিলেন। সে সময় দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ছিল না। গ্রামে শিক্ষা ও সংস্কারের প্রবেশ মাত্রও হয় নাই। কিন্তু নিত্যকালী দেবী স্বামীর নিকট যে আদর্শ পাইয়াছিলেন ও নারীজাতির উন্নতির যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে প্রবেশ করিয়াছিল উহা তাঁহাকে অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত করিয়াছে। দেবরগণ কন্যা দুইটি লইয়া গিয়া ইচ্ছামত কুলীনে বিবাহ দিবে, স্বামীর অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না, এজন্য তিনি বিপদকে গ্রাহ্য করেন নাই। গোপনে পুত্রকন্যাগণকে লইয়া একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় ১৫ দিনে সুন্দরবন ঘুরিয়া কলিকাতায় ব্রাহ্মগণের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। পথে ডাকাতের হাতে পড়িয়া সমূহ বিপদের সম্ভাবনা হইয়াছিল, কিন্তু যিনি শুভসঙ্কল্পের সহায় তাঁহার ইচ্ছাতে কোন বিপদ তাঁহাদের ঘটে নাই। একটি বিধবা নারীর এই প্রকার ধর্ম্মোৎসাহ ও সাহস দেখিয়া ব্রাহ্মগণ অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। যুবকগণ ইঁহাদের ব্যবস্থার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন। ঢাকার ৺নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ৺রাজমোহন সেন ও শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই নারীর সৎসাহসে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ইঁহাকে ব্রাহ্মযুবকগণ মাতৃস্থানীয়া জ্ঞান করিতেন। অনেক সময়ে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া এই যুবকগণকে তিনি আহার করাইতেন।

অম্বিকাচরণ এবং তাঁহার বন্ধুগণ এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একটি ভোজের আয়োজন করিলে নিত্যকালী দেবী এবং

তাঁহার কন্যাগণ আনন্দের সহিত রন্ধনের ভার লইয়াছিলেন। জননী নিত্যকালীর রন্ধনে বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। সন্তানতুল্য যুবকগণের এই ব্যাপারে তিনি উৎসাহ ও যত্নের সহিত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ধর্ম্মশীল যুবক দলের নেতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, কৃষ্ণবিহারী, পণ্ডিত শিবনাথ ইঁহারা সকলেই সেই ভোজে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। যুবকগণ প্রবল উৎসাহে রন্ধন করা ডাল তরকারীর হাঁড়ি বৈঠকখানা হইতে মাথায় বহিয়া মুসলমানপাড়া লেনের মেসে আনিয়াছিলেন। মহা আনন্দে তাঁহাদের প্রীতিভোজন হইয়াছিল। নিত্যকালী দেবী ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে রাখিয়া কন্যাগণের উপযুক্ত শিক্ষাদান করেন এবং যথাসময়ে দুইটি সৎপাত্রের সঙ্গে কন্যা দুইটির বিবাহ দেন। সাধু ইচ্ছার সহায় পরমেশ্বর, এই বাক্যের সার্থকতা তাঁহার জীবনে সফল হইয়াছে।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এক কুলীন ব্রাহ্মণ-কন্যার পক্ষে তাঁহার প্রিয়তমা কন্যাদিগকে অসবর্ণ বিবাহে অর্পণ করা যে কত সৎ সাহসের বিষয় ছিল তাহা আজ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। কিন্তু কন্যাদিগের কল্যাণের প্রতি একমাত্র লক্ষ্য করিয়া তাঁহার দুই কন্যাকেই অসবর্ণ বিবাহ দিতে এক মুহূর্ত্তও দ্বিধা করেন নাই অম্বিকাচরণ এই পরিবারের জ্যেষ্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব।

তখনকার ভ্রাতৃত্ব এমন এক স্বর্গীয়ভাবে পূর্ণ ছিল যে তাহার স্মৃতিতেও আনন্দ হয়। একের জন্য অপরে সুখস্বার্থ ত্যাগ

করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। আপনার সহোদরগণের মধ্যেও বুঝি বা ততোধিক ভালবাসা জন্মে না। এই প্রকার প্রীতিবদ্ধ ধর্ম্মশীল যুবকগণ একত্র বাস করিয়া অধ্যয়ন করিতেন, ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেন, ত্যাগ ও পরহিতৈষণার অনুশীলন করিতেন। তাঁহাদের উদ্যম, উৎসাহ, কর্ম্মচেষ্টা দেখিয়া সকলেরই আনন্দ হইত, তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের যে চিত্র সম্মুখে উপস্থিত হইত তাহাতে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাসমন্বিত আশা জন্মিত। অম্বিকাচরণ এই প্রকার বিশুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্য দিয়া পবিত্র ছাত্রজীবন অতিবাহিত করিয়া এক পুণ্যময় জীবনে অগ্রসর হইলেন।

ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে সম্পর্ক।

পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের যে সকল যুবক ব্রহ্মানন্দের নিকট নব ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মানন্দের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহাদের উন্নতি দর্শনে তাঁহার কত আনন্দ হইত। তিনি তাঁহাদের সঙ্গে যোগ অনুভব করিতেন। ঢাকার সঙ্গতের সভ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন "বিলাত যাইবার পূর্ব্বে ঢাকার সঙ্গতের সভ্যগণ যেমন আমাকে ঢাকায় অভ্যর্থনা করিলেন লণ্ডন নগরেও তেমনি অভ্যর্থনা করিবেন।" ঢাকা সঙ্গতের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় এই সময় লণ্ডন নগরে সিভিলসার্ব্বিশ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে-ছিলেন। তিনি তাঁহাদের নেতা ব্রহ্মানন্দকে পাইয়া মহা

আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন ও অভ্যর্থনা সহকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষিত যুবকগণের কর্ম্মশীলতা ও ধর্ম্মসাধনে উৎসাহ, উত্তম অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের ত্যাগ, কষ্টসহিষ্ণুতা ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই দলের অন্যতম অম্বিকাচরণ কলিকাতায় ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়া তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। নীরব প্রকৃতি, মধুর ব্যবহার, গভীর ধর্ম্মনিষ্ঠা যাহা অম্বিকাচরণের বিশেষত্ব সকলই ব্রহ্মানন্দের স্নেহ আকর্ষণের কারণ হইয়াছিল। অম্বিকাচরণ ব্রহ্মানন্দের প্রতি গুরুভক্তি প্রদান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন ;—

"সে এক আশ্চর্য্য সময় ছিল। সে প্রেমোচ্ছ্বাসের সময় তখন কেবল দয়াময় পিতাকে ভালবাসিতাম এবং তাঁহার পুত্র কন্যাদিগকে ভালবাসিতাম, অন্য কিছু জানিতাম না। আচার্য্য যে উপদেশ প্রদান করিতেন প্রাণপণে তাহা গ্রহণ করিতাম"।

ব্রহ্মানন্দের প্রতি তাঁহার এইরূপ ভাব চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল ব্রাহ্মসমাজের পরবর্ত্তী আন্দোলনে ব্রাহ্মগণের অনেকের প্রেমভক্তি বিচলিত হইয়াছিল কিন্তু অম্বিকাচরণ উহা হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিলেন। এক পক্ষে যোগ দিয়া অপর পক্ষের বিরোধ হইতে তাঁহাকে কখনও দেখা যায় নাই। ইহাতেও তাঁহার প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্যই প্রতীয়মান হইবে। বাল্যে ক্রীড়াক্ষেত্রে

যৌবনে শিক্ষাক্ষেত্রে, পরবর্ত্তী জীবনে মত ও ধর্ম্ম বুঝিতে তিনি যেরূপ সাম্য ও সামঞ্জস্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছে বলিলে ভুল হইবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অধ্যাপনা।

অম্বিকাচরণ এম, এ পাশ করিবার অল্প দিন পরে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তিনি একশত টাকায় কৃষ্ণনগর কলেজের রসায়নের অধ্যাপক মনোনীত হইলেন। যেমন ছাত্রাবস্থায় তেমনি অধ্যাপকের পদেও অল্প দিনেই তাঁহার সুনাম হইল। কেমিষ্ট্রির প্রক্রিয়ায় (experiments) তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সহিষ্ণুতা, হিতবুদ্ধি, মিষ্টব্যবহার এবং শিক্ষণীয় বিষয় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা তাঁহাকে প্রশংসাভাজন করিয়াছিল।

তখন তাঁহার বয়স ২২ বৎসর। অনেক ছাত্র বয়সে তাঁহা অপেক্ষা বড়ও ছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধা ছিল। সার আশুতোষ চৌধুরী তাঁহার একজন ছাত্র। শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বসু (মিষ্টার পি, এন, বসু) তাঁহার ছাত্র ছিলেন। তাঁহার ছাত্রগণের অনেকে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা

অম্বিকাচরণের কথা স্মরণ করিয়া গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

৺পরেশরঞ্জন রায় লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যাপনা কালে তিনি স্বীয় শিষ্যবর্গের হৃদয়ের অগাধ ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহার পরিচয় তাঁহার প্রাচীন শিষ্যমণ্ডলীর নিকট এখনও প্রচুর পাওয়া যায়। কয়েক বৎসর হইল দার্জ্জিলিং পাহাড়ে তিনি স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে গমন করেন। সেখানে তখন আমিও ছিলাম। তাঁহার একটি পুরাতন শিষ্য শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও ছিলেন। বিজয় বাবু তাঁহার পাঠ্যাবস্থার কথা বলিতে গিয়া যে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সহিত অম্বিকাচরণের কথা বলিতেন, তাহা শুনিয়া আমার মনে হইত তেমন গুরু বুঝি আর হয় না। আর দেখিতাম গুরুশিষ্য মিলিয়া তখনও কত জ্ঞানচর্চ্চা করিতেন। যখনই বেড়াইতে বাহির হইতাম দেখিতাম পাহাড়ের সুন্দর একটি [illegible]ন কোণ বাছিয়া গুরু শিষ্য মিলিয়া বসিয়া আছেন। ক[illegible] পালিভাষায় বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনী আলোচনা করিতেছেন। তাঁহার শিষ্য-বর্গের অনেকেই আজ উচ্চপদে অধিরূঢ়, কিন্তু যখন অম্বিকাচরণের নিকট তাঁহারা উপস্থিত হইতেন, শিষ্য-ভাবে অতি নম্রভাবেই আসিতেন। অথচ তাহার মধ্যে সঙ্কোচ ছিল না। হৃদয়ের গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব অনুরাগ তাঁহাদিগকে পরস্পরের নিকট আকর্ষণ করিত।"

কলেজের ক্ষেত্রেই তাঁহার সঙ্গে ছাত্রগণের সম্বন্ধ ছিল এমন নয়। তিনি তাঁহাদের বন্ধু ও পরামর্শদাতা ছিলেন। তিনি ছাত্রগণকে যেরূপ উপদেশ দিতেন তাহাতে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলিতেন—"যখন যে কর্ম্ম করিবে সেই কর্ম্মে এমন মনোযোগী হইবে যেন আর কিছুই তোমার কর্ত্তব্য নাই। আহারের সময় আহার, ক্রীড়ার সময় ক্রীড়া প্রধান কর্ম্ম হইবে। যাঁহারা যত্ন করিয়া আহার প্রস্তুত করেন তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণ করিবে। কৃতজ্ঞতাহীন হইয়া অন্ন গ্রহণ করিলে তাহাতে শরীর মনের কল্যাণেরই ব্যাঘাত হয়। উদাসীনভাবে যে ক্রীড়া তাহাও ব্যর্থ। তাহাতে স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি হয় না। ক্রীড়ায় স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে এই বিশ্বাস লইয়া ক্রীড়ায় নিযুক্ত হইবে।" সব কর্ম্মে এইরূপ উদ্দেশ্যের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতেন।

মাতৃবিয়োগ।

কৃষ্ণনগরে কার্য্য করিবার কিছুদিন পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ও মাতার মৃত্যু হয়।

জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবিয়োগে ভ্রাতার পুত্রকন্যাগণের সমস্ত ভার তাঁহাকে লইতে হইয়াছিল। তিনি সাধ্যমত আজীবন এই কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছেন। মাতৃবিয়োগে এমন আঘাত পাইয়াছিলেন যে পৃথিবীতে আর স্নেহ মমতার স্থান রহিল না তাঁহার এমন মনে হইয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়ে তিনি এই বিশ্বাস

পাইয়াছিলেন, শোক, দুঃখ, সঙ্কটে ঈশ্বরই মানবের সম্বল। আর পৃথিবীর মার স্নেহ কেহই চিরদিন ভোগ করিতে পারে না। একদিন অবশ্যই তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। এই বিশ্বাস তাঁহার শোকে সান্ত্বনার স্থল হইয়াছিল।

বিবাহ।

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করিবার চিন্তা তাঁহার মনে উপস্থিত হইয়াছিল।

এই সময় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলিকাতা নারিকেলডাঙ্গাতে যে ভারত আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন প্রচারকগণ এবং অনেক ব্রাহ্মপরিবার তথায় বাস করিতেন। একত্র বসবাস এবং ধর্ম্ম সাধন করিয়া ধর্ম্ম-পরিবার গঠন এই আশ্রমের উদ্দেশ্য ছিল। আশ্রমে একটি মহিলা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহাতে বালিকাগণ বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। প্রচারকগণ মেয়েদিগকে শিক্ষা দিতেন।

অম্বিকাচরণ যাঁহাকে পরে ধর্ম্মসঙ্গিনী মনোনীত করিয়াছিলেন তিনি তখন ঐ ভারতাশ্রমে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিতেছিলেন। শ্রীমতী নিত্যকালী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুদক্ষিণার সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির হয়।

অম্বিকাচরণ এমন ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন যে কোন ব্যাপারই কেবল পুরুষকারে সম্পন্ন হইবে এমন মনে করিতেন না। ঈশ্বরের কৃপা ও আশীর্ব্বাদের উপর তাঁহার একান্ত নির্ভর ছিল। এজন্য

বিবাহ স্থির হইলে ভাবী পত্নীকে লিখিয়াছিলেন—“জীবনের পরীক্ষায় দেখিয়াছি দয়াময়ের কৃপা ভিন্ন কিছু হয় না। যতবার নিজে নিজে চেষ্টা করিয়াছি ততবার বিফল-মনোরথ হইয়াছি। Entrance হইতে M. A. পরীক্ষা পর্য্যন্ত যতবার খুব ভাল হইয়া pass হইব এই উচ্চ আশা করিয়াছি তত বারই কোন না কোন বিপদ উপস্থিত হইয়া আমার ইচ্ছাকে অসিদ্ধ রাখিয়াছে। যখন বলিয়াছি আমি এসব কিছুই চাই না তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তখন নিতান্ত অলৌকিক রূপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। এক এক বার এমন ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা অন্যে দেখিয়াও বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারে নাই। তাই বলি নিজে ইহা করিব উহা করিব এমন বাক্য মুখে আনিও না। বল—সরল হৃদয়ে—“দয়াময় পিতা আমি তোমাকেই চাই আর কাহাকেও চাই না। অতি হৃদয়ের বন্ধুকেও নয় যদি তোমার ইচ্ছা না হয়” দেখিবে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিবে কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে হইবে না। ধন, জন, মান, সম্পদ যাহা কিছু প্রয়োজন নিশ্চয় তিনি সমস্তই দিবেন। আর যদি তাহা না কর দেখিবে ঈশ্বরকেও পাইলে না যাহাদের জন্য তাঁহাকে ছাড়িলে তাহারাও তোমার হইল না।”

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন ঢাকা সহরে অম্বিকাচরণের বিবাহ হয়। এই উপলক্ষে ভক্তিভাজন কান্তিবাবু প্রভৃতি কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু ঢাকায় গমন করিয়াছিলেন। কয়েক দিন উপাসনা, প্রার্থনা, কীর্ত্তন, প্রসঙ্গ, আমোদ, আহ্লাদে বিবাহ ব্যাপার এক উৎসবের আকার ধারণ করিয়াছিল। এখন যেমন অনেক

স্থলে বিবাহে আমোদই প্রধান বিষয়, উপাসনা নাম মাত্রে পর্য্য-বসিত হয়, সে সময় ব্রাহ্ম পরিবারের এরূপ অবস্থা ছিল না। তখন উপাসনা ধর্ম্মালোচনা, সকল অনুষ্ঠানের প্রাণ ছিল। অম্বিকা চরণের বিবাহে তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছিল। ব্যক্তিগত জীবনে যত দিন ধর্ম্মের প্রভাব থাকে ততদিন পারিবারিক অনুষ্ঠানেও উহার গুরুত্ব স্বীকৃত হয়। তদভাবে অনুষ্ঠানে উহার কোনই প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় না।

অম্বিকাচরণ সহধর্ম্মিণীর সহিত কৃষ্ণনগর আসিয়া পুনরায় কলেজের কর্ম্মে নিয়োজিত হইলেন।

চরিত্রের প্রভাব।

কৃষ্ণনগরে একটি কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র বঙ্ক বাবুর সঙ্গে বন্ধুতা সূত্রে এই পরিবারে তাঁহার পরিচয়। পরে পরিবারের সকলের সঙ্গেই প্রীতি জন্মে। তিনি পরিবারের এক জন বলিয়া গণ্য হন। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও অম্বিকাচরণের প্রতি তাঁহাদের কিছু মাত্র ভিন্ন ভাব ছিল না। কলেজের সময় ব্যতীত অধিকাংশ সময় এই গৃহে তিনি বাস করিতেন। আর কর্ত্তা-গৃহিণী তাঁহাকে সন্তানতুল্য স্নেহ করিতেন। তিনি যাহা খাইতে ভালবাসিতেন গৃহিণী যত্নপূর্ব্বক সে সকল রন্ধন করিয়া খাওয়াইতেন। গৃহের সন্তানগণের সঙ্গে তাঁহার কোন প্রভেদ ছিল না। তখনও জাতিভেদ ভঙ্গের সাহস লোকের মনে জন্মে নাই। তৎসত্ত্বেও

এই হিন্দুগৃহে ব্রাহ্ম অম্বিকাচরণের এমন আদর হইয়াছিল। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র, ধর্ম্মভাব ও মধুর ব্যবহারে গৃহকর্ত্রী ব্রাহ্মণ-কন্যা, সামাজিকতা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

অম্বিকাচরণ অসবর্ণ বিবাহ করিয়া কৃষ্ণনগর আসিলে শ্রীমতী সুদক্ষিণা এই পরিবারে পুত্রবধূর ন্যায় সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে রন্ধনগৃহে লইতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

এই পরিবারের একটি দশবৎসর বয়স্কা কন্যার কোন কুলীনের সঙ্গে 'করণ' স্থির হইয়াছিল। কুলীনেরা কুল রক্ষার জন্য কুলীন গৃহের কোন সন্তানের সঙ্গে কন্যার সাময়িক বিবাহ দিয়া কুল রক্ষা করিয়া থাকেন। ইহাকে তাঁহারা করণ আখ্যা দেন। কিন্তু যে মেয়ের সম্বন্ধে এই প্রকার অনুষ্ঠান হয় কোন ভালছেলে সে মেয়ের পাণিগ্রহণ করে না। বন্ধুর গৃহের একটি বালিকার সর্ব্বনাশ হইতেছে দেখিয়া অম্বিকাচরণ তাঁহার কলেজের একটি সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ যুবক শ্রীযুক্ত কিশোরী লাল সরকারকে সম্মত করাইয়া করণের পূর্ব্বরাত্রিতেই বালিকার বিবাহ দিয়াছিলেন। অন্ধকার রাত্রিতে লণ্ঠন লইয়া বর ও পুরোহিতকে বিবাহস্থলে উপস্থিত করিতে অম্বিকাচরণকে অনেক ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদ্বারা একটি বালিকার ভবিষ্যৎ রক্ষা হওয়ায় ইহা তাঁহার নিকট আদৌ ক্লেশকর বোধ হয় নাই।

কৃষ্ণনগরে সার আশুতোষ চৌধুরীর মাতার স্নেহ তিনি লাভ করেন। একবার অম্বিকাচরণ এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী এক সঙ্গে পীড়িত হইলে সার আশুতোষের মাতা আসিয়া

তাঁহাদের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। ইনি এখনও জীবিতা আছেন এবং অম্বিকাচরণের কথা বলিয়া স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

অম্বিকাচরণ কৃষ্ণনগরে কেবল অধ্যাপনায় আপনাকে আবদ্ধ রাখেন নাই। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যেও তিনি ব্রতী ছিলেন। রবিবার উপাসনার কার্য্য তাঁহাকে করিতে হইত। তাঁহার ধর্ম্মভাব এবং চরিত্রে অনেক হিন্দুসমাজের লোকেও উপাসনায় উপস্থিত হইতেন। এমন অনেক দিন হইয়াছে পকেটে করিয়া মোমবাতি ও দেশলাই লইয়া গিয়া দরজা খুলিয়া বাতি জ্বালিয়া একাকী উপাসনা করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন।

স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী।

কৃষ্ণনগরে স্বর্গীয় মহাত্মা রামতনু লাহিড়ীর স্নেহ তিনি বিশেষ ভাবে লাভ করেন। উক্ত মহাত্মার বিনয়, ভালবাসা এবং জ্ঞানানুরাগের বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। অম্বিকাচরণের চরিত্রে ও জ্ঞানানুরাগে মুগ্ধ হইয়া লাহিড়ী মহাশয় তাঁহাকে পুত্রসম স্নেহ করিতেন এবং অনেক সময় অম্বিকাচরণের গৃহে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করিয়া সুখী হইতেন। কখন কখন পালকি করিয়া তাঁহার কলেজে গিয়া বলিতেন—"আমাকে ভাল ভাল জিনিষ আহার করাও।" বলা বাহুল্য তিনি জড়ীয় খাদ্যের কথা বলিতেন না। কিন্তু জ্ঞানান্নের কথাই বলিতেন। অম্বিকাচরণ তাঁহাকে ভাল ভাল বই পড়িয়া শুনাইতেন।

এইরূপে জ্ঞান ও ধর্ম্মালোচনার সূত্রে এই দুইটি নবীন ও প্রবীণের মধ্যে গভীর ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল।

কর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্ম।

অম্বিকাচরণ কৃষ্ণনগরে কি ভাবে কাটাইতেন তাঁহার নিজের লেখা হইতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি ;—

"কাল বৎসরের শেষ দিন গিয়াছে। কাল রাত্রিতে তথাকার কয়েকটি ব্রাহ্মবন্ধু সমভিব্যাহারে কৃষ্ণনগরের রাজার শ্রীবন নামক ভবনে গমন করিয়াছিলাম। তথায় কীর্ত্তন ও উপাসনা ইত্যাদিতে প্রায় সমস্ত রাত্রি কর্ত্তন করিয়াছিলাম। শ্রীবন স্থানটি অতি রমণীয়। অঞ্জনা নামক নদীর তীরে প্রশস্ত প্রান্তরের মধ্যে অবস্থিত। চারিদিকে কেবলই বাগান। সেই চৌতালা দালানের উপরিভাগে উঠিয়া চন্দ্রালোকে সুশোভিত নদী, উদ্যান ও বৃক্ষ-রাজির শোভা দর্শনে যে আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হয়, তাহা সম্ভোগ না করিলে বর্ণনা করা যায় না।"

ধার্ম্মিক ব্যক্তি যেখানে যে কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন ধর্ম্মই তাঁহার প্রধান অবলম্বন হয়। অম্বিকাচরণ কর্ম্মক্ষেত্রে এই ধর্ম্ম-জীবন যাপন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজে মতভেদ।

তাঁহার কৃষ্ণনগরে অবস্থান কালে ব্রাহ্মসমাজে মতভেদের ভীষণ বহ্নি প্রজ্বলিত ও তাহা হইতে নানা প্রকার হলাহল উৎপন্ন

হইতে থাকে। দলাদলির কোলাহল একবার আরম্ভ হইলে উহা কোন পক্ষকেই প্রকৃতিস্থ থাকিতে দেয় না। নিন্দা, বিদ্বেষ, অপ্রেম, যাহা দলাদলির অবশ্যম্ভাবী ফল—তাহা অজ্ঞাতসারে উভয় পক্ষে বিস্তারিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের নেতা অগ্রণী আচার্য্য কেশবচন্দ্রকে লইয়া এই আন্দোলনের সূত্রপাত হওয়ায় উহা বঙ্গদেশময় বিস্তারিত হইয়াছিল। সরল ধর্ম্মবিশ্বাসিগণ এই কলহ, বিবাদে মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইয়াছিলেন এবং অপ্রেম হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন। অম্বিকাচরণ এই প্রকৃতির একজন। আচার্য্যের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। এই শ্রদ্ধা আচার্য্যের বিপক্ষ দলের প্রতিও তাঁহার বিরূপ ভাব জন্মায় নাই। উভয় দলে তাঁহার ধর্ম্মবন্ধুগণ ছিলেন, আর তিনি তাঁহাদের সকলের সঙ্গে বন্ধুতা রক্ষা করিয়াছেন।

সন্তান।

কৃষ্ণনগরে থাকিতে অম্বিকাচরণের একটি কন্যা এবং পরে বিলাত যাত্রার প্রাক্কালে একটী পুত্র-সন্তান হয়। এই পুত্রটি এক বৎসর মধ্যেই মাতৃক্রোড় শূন্য করিয়া চলিয়া যায়। ইহার পর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার আরও একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াই গত হইয়াছিল। সন্তান হওয়া পিতামাতার আনন্দের ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সঙ্গে পিতার দায়িত্ববোধ অম্বিকাচরণের মনে প্রবল হইয়াছিল। তিনি দারিদ্র্যকে



শ্রীমতী সুদক্ষিণা সেন।

ভয় করিতেন। পরিবার বৃদ্ধিতে আয় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। কলেজে তিনি একশত টাকা পাইতেন। সন্তানগণের উপযুক্ত শিক্ষার পক্ষে এই আয় যথেষ্ট নয়। সন্তানগণের উপযুক্ত শিক্ষা, দরিদ্র ও বন্ধুবান্ধবের সহায়তা প্রভৃতি পারিবারিক কর্ত্তব্য সাধনের জন্য আয় বৃদ্ধির কি উপায় হইতে পারে এই চিন্তা তাঁহার মনে উপস্থিত হইয়াছিল। এই সকল সাংসারিক চিন্তা মানুষের ধর্ম্মকে কিরূপ ম্লান করে আমরা সর্ব্বদাই তাহার দৃষ্টান্ত দেখিতেছি। কিন্তু অম্বিকাচরণের সকল অবস্থাতেই উপাসনা, প্রার্থনা, ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ প্রধান অবলম্বন ছিল। ইহাতেই সাংসারিক ভাবনা চিন্তার মধ্যেও তাঁহার ধর্ম্মভাব ম্লান হইতে পারে নাই। তিনি পত্নীকে বলিতেন—"এস ভাল করিয়া দয়াল নামটি গান করি। সংসারের ভাবনা, চিন্তা, বিপদ, যন্ত্রণার মধ্যে এমন সুমিষ্ট নাম আর নাই।" ধর্ম্মপথ ধরিয়া থাকিলে মানুষের উন্নতির অবশ্যই উপায় হয়, অম্বিকাচরণের জীবন তাহারই সাক্ষ্য দিয়াছে।

বিলাত যাত্রা।

এই সময় গবর্ণমেণ্ট বাৎসরিক দুইজন ছাত্রকে বৃত্তি দিয়া কৃষি শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে পাঠাইবার প্রস্তাব নির্দ্ধারণ করেন। অম্বিকাচরণ পত্নীর অনুমতি লইয়া ইহারই একটির জন্য প্রার্থী হইলেন। তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে এমন আশা তাঁহার ছিল না। কারণ তিনি ছাত্র নহেন, অধ্যাপক। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার

আবেদন গ্রাহ্য হইল, তিনি কলেজ হইতে বিদায় লইয়া ১৮৮০ খৃস্টাব্দের শেষভাগে ইংলণ্ডে গমন করিলেন। গবর্ণমেণ্টের এই বৃত্তি সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালার অম্বিকাচরণ, এবং বেহারের মিঃ সখাবৎ হোসেন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তথায় সিসেস্টার কলেজে (Ciren Cister College) তাঁহাকে দুই বৎসর ছয় মাস অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল। অধ্যাপকগণের তিনি অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে ছাত্রের ন্যায় নয়, কিন্তু বন্ধুজনোচিত ব্যবহার করিতেন।

এম, এ পাশ করিবার প্রায় সাত বৎসর পরে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন। এত দিন অধ্যাপকের পদে কাজ করিয়া পুনরায় ছাত্ররূপে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া ও কলেজের নিয়ম মানিয়া চলা অবশ্যই সহজ নয়। পরীক্ষায় ভালরূপ উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে দুঃখ ও লজ্জার বিষয় হইবে মনে করিয়া তাহার চিন্তা হইয়াছিল। পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার দিবস সিনেট হলে গিয়া কি জানি কি শুনিতে হয় এই ভয়ে তিনি অধ্যাপকের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। অধ্যাপক যদিও পূর্ব্বে তাঁহাকে কিছুই বলিতে পারেন নাই তবু সাহস দিয়া সন্ধ্যার ভোজে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। অবশেষে হলে গিয়া শুনিলেন সর্ব্বোচ্চ নম্বর পাইয়া তিনিই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি এত নম্বর পাইয়া ছিলেন যে তত নম্বর পূর্ব্বে কেহ কখনও প্রাপ্ত হন নাই। এইরূপ সুফল লাভে বিশ্বাসী সন্তানের মত তিনি তাঁহার চিরন্তন উপাস্য দেবতাকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন।

এই সময় বিলাতের বিখ্যাত টাইমস পত্রিকায় পরীক্ষার ফল এইরূপ বাহির হইয়াছিল ;—

Royal Agricultural College Cirencester;—The diplomas and scholarships of the spring session have been conferred as below :—The diploma was gained by Ambika Charan Sen, Bengal Scholar, Bengal, 1670 ; Edward Charles Ozanne, Manor House, Guernsey, 1602 ; Syed Sakhawat Hossein, Bengal Scholar, Bengal 1595 ; Hubert Edward Pelham-Clinton, Moor Court, Stroud, 1477 ; Edward James Cayalet, Bransford Court, Warcester, 1397 ; Matthew Barr, Kircudbright, N. B, 1378 ; George Nicalman, St Vincent street, Glasgow, 1337. Maximum marks 1800, qualifying marks 1200. * * * *.

* * The present occasion being that of conferring the diploma on Messrs. Sen and Hossein, the two Indian scholars first sent to the College by the Bengal Government, Mr. Fitygerald of the India Office, was present, and expressed the great regret of the Under-Secretary of state for India, at his unavoidable absence.

Mr. Sen obtained the highest number of marks ever reached for the diploma.

"The Times". April 21, 1883.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কৃষি।

অম্বিকাচরণ ১৮৮৩ সনে ইংলণ্ড হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। কলেজ হইতে তিনি বিদায় লইয়া গিয়াছিলেন, এজন্য পুনরায় কলেজের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এই পদে তাঁহাকে অধিক দিন কাজ করিতে হয় নাই। পাঁচ ছয় মাসের মধ্যেই গবর্ণমেণ্ট অযাচিত রূপে তাঁহাকে Statutory সিভিল সার্বির্সে প্রবেশাধিকার দিয়া আরার এসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিয়োজিত করিলেন।

আরা ও বকসারে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিবার পর তিনি বর্দ্ধমান ও শিবপুর ফারমের তত্ত্বাবধায়ক মনোনীত হন। এই সব কৃষিক্ষেত্রের কার্য্য তাঁহার দ্বারাই আরব্ধ হয়। কৃষি ক্ষেত্রে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ও নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছিল। বঙ্গদেশে তিনিই কৃষি পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার যত্নে উক্ত দুই স্থানে কৃষি-ক্ষেত্রের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। বিলাতে কৃষি বিষয়ে যে শিক্ষা তিনি পাইয়াছিলেন বঙ্গদেশে কৃষি পরীক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়া তিনি সেই শিক্ষাকে সার্থক করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় অনুসারে এ দেশের কৃষকদের সম্বন্ধে তিনি যে রিপোর্ট প্রদান করেন তাহাতে প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এ দেশীয় কৃষকগণের কৃষি সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস নিতান্ত অগ্রাহ্য করিবার বিষয় নয়। আর এদেশের কৃষির উন্নতির জন্য সম্পূর্ণ বিদেশীয় রীতি অবলম্বন

না করিয়া দেশীয় প্রথার সংস্কারই কর্ত্তব্য। তাঁহার এই প্রস্তাব গবর্ণমেন্ট অগ্রাহ্য করেন নাই।

আরব্ধ কৃষিক্ষেত্রে তাঁহার কার্য্যের সুফল দর্শনে তাঁহার উপরিস্থ কর্ম্মচারী মিষ্টার ফিনুকেন (Mr. Fenucane) অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত মহোদয় তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় এমন সন্তুষ্ট ছিলেন যে তাঁহার উপর সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন। সরল প্রকৃতির কৃষকগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাঠে অতিবাহিত করিতে, স্বহস্তে লাঙ্গল পাড়িয়া, মাটি ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে ও তাহাদের উন্নতি বিধানে সহায়তা করিতে তিনি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করিতেন। শাসন বিভাগে কর্ম্ম কালেও কৃষি, কৃষক ও নিম্ন-শ্রেণীর উন্নতির আকাঙ্ক্ষার পরিচয় তাঁহার কার্য্যে পাওয়া গিয়াছে। এজন্য কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াও কিছু কাল সপ্তাহে দুই দিন করিয়া কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমান গিয়া কৃষকদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই সময় যদিও তাঁহার শরীর বেশ সুস্থ ছিল না, তবুও এই কর্ম্মে সময় ও পরিশ্রম দিয়াছিলেন। অথচ ইহা সম্পূর্ণ অবৈতনিক কার্য্য। বর্দ্ধমানে কৃষকদের শিক্ষার জন্য সমস্ত দিন যেরূপ পরিশ্রম করিতেন তাহা সুস্থ লোকের পক্ষেও সহজ-সাধ্য ছিল না।

কৃষি শিক্ষার কিঞ্চিৎ সহায়তা হইবে ভাবিয়া তিনি কৃষি-প্রবেশ নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ এবং তাহার দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই পুস্তকে তাঁহার কৃষি

বিষয়ক অভিজ্ঞতার সুন্দর পরিচয় রহিয়াছে। কর্ম্মসূত্রে বঙ্গদেশের নানা স্থানে ঘুরিয়া ঐ ঐ অঞ্চলের মৃত্তিকা সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা গ্রন্থবদ্ধ করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কিরূপে কৃষির উন্নতি হইতে পারে তাহা দেখাইয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ প্রকাশে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে বিচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও তিনি কৃষি বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন না। বোধ হয় এই গ্রন্থখানির প্রচারের সুবন্দোবস্ত হয় নাই, অথবা কৃষি সম্বন্ধে সাধারণের মনোযোগের অভাবে উহার প্রচার হইতে পারে নাই।

তিনি স্বদেশভক্ত ছিলেন। স্বদেশের উন্নতি, একান্ত মনে ইচ্ছা করিতেন। স্বদেশের উন্নতির উদ্দেশ্যেই তাঁহার কৃষি কর্ম্মে এত উৎসাহ। তাঁহার কৃষি বিষয়ক উৎসাহের আরও পরিচয় আছে।

যখন শিবপুর ফারমের ভার তাঁহার উপর ছিল তখন একবার ডুমরাওন একটি কৃষি প্রদর্শনী হয়। ঐ প্রদর্শনীতে তাঁহার উদ্ভাবিত একখানি লাঙ্গলের আদর্শ (model) উপস্থিত করিয়াছিলেন। ঐ লাঙ্গল এ দেশীয় প্রচলিত লাঙ্গল হইতে স্বতন্ত্র। আর উহাদ্বারা জমির চাষ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। উহাদ্বারা কর্ষিত মৃত্তিকা এক পার্শ্বে সরিয়া পড়ে। গবর্ণমেণ্ট হইতে এই লাঙ্গলের জন্য তিনি পুরস্কার পাইয়াছিলেন। অদ্যাপি এ দেশের শত শত গ্রামে উহার ব্যবহার হইতেছে।

তিনি যখন রংপুরে ডিস্‌ট্রিক্ট্‌ এবং সেসন জজের পদে ছিলেন

তখন ভারতীয় কৃষির ডিরেক্টার জেনেরল (Director Genaral of Agriculture for India) পদের সৃষ্টি হয়। কৃষির উন্নতির আগ্রহ জন্য অম্বিকাচরণ এই পদের এইরূপে প্রার্থী হন যে "গবর্ণমেণ্ট এ দেশের কৃষির উন্নতির জন্যই আমাকে বিলাত হইতে শিখাইয়া আনিয়াছেন, আর এ দেশের কৃষি সম্বন্ধেও আমার কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট কৃষি কার্য্যে আমাকে ব্যবহার করুন। আর এই পদে নিযুক্ত হইলে আমি শাসনকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কৃষির উন্নতি ও দেশের উপকার করিতে পারিব।" কিন্তু গবর্ণমেণ্টে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই, একজন সাহেব ঐ পদে মনোনীত হইয়াছিলেন।

১৯০৬ সনে ভবানীপুরে কলিকাতার যে শিল্পপ্রদর্শনী হয় উহাতে অম্বিকাচরণকে প্রদর্শিত কৃষি সামগ্রীর বিচারক মনোনীত করা হইয়াছিল। কৃষি দ্রব্য সমূহের বিচার করিয়া শ্রেণী বিভাগ করা, পুরস্কারের যোগ্য ব্যক্তি মনোনীত করা বড় সহজ কর্ম্ম নয়। এই কার্য্যে তাঁহাকে দুই তিন মাস ক্রমাগত প্রত্যহ ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। অবসর কালে অসুস্থ শরীর লইয়া অবৈতনিক কার্য্যে এইরূপ শ্রম তাঁহার কৃষি কর্ম্মে ঐকান্তিক উৎসাহেরই নিদর্শন।

কৃষিবিষয়ে স্বাভাবিক অনুরাগ জন্যই ভাল ভাল তুলার বীজ আনিয়া বাড়ীতেও বপন করিয়াছিলেন, এবং ঐ সকল গাছে সুন্দর তুলা দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন।

বিলাতে কৃষি শিক্ষা প্রাপ্ত গিরিডি প্রবাসী শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত

দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত বিবরণে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে কৃষিবিষয়ক অভিজ্ঞতারও সুন্দর পরিচয় রহিয়াছে। এজন্য এস্থলে উহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতেছি।

"১৮৭৫খৃঃ অব্দে আমি কৃষ্ণনগরে যাই ও কলেজের স্কুল বিভাগের ২য় শ্রেণীতে ভর্ত্তী হই। তখন অম্বিকাবাবু কলেজের কেমিষ্ট্রীর প্রফেসার। কিছুদিন পরেই আমি তাঁর সহিত পরিচত হই। সময়ে সময়ে তাঁর নিকটে যাইতাম, বিশেষ সমবয়স্ক ছাত্রদের সঙ্গে কোন প্রাকৃতিক তত্ত্ব লইয়া তর্ক হইলে তাঁর নিকটে মীমাংসার জন্য যাইতাম। সে সকল কথা অতি সামান্য হইলেও তিনি অতি স্নেহের সহিত আমাদিগকে সে সকল তত্ত্ব বুঝাইয়া দিতেন ও সে সকল প্রশ্ন লইয়া যে আমরা চিন্তা করি তাহার জন্য বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন। তিনি বলিতেন বাল্যকালে গল্পের বই পড়া উচিত নয়, বিজ্ঞানের আলোচনাই শ্রেষ্ঠ, এবং কখন কখন কলেজের লাইব্রেরী হইতে আমাকে সরল বৈজ্ঞনিক গ্রন্থ পড়িতে দিতেন। তিনি স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য ছিলেন। সময়ে সময়ে তাঁর উপাসনাতেও যোগ দিতাম। কিন্তু আমি স্কুলের ছাত্র ও তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, সুপণ্ডিত, কলেজের অধ্যাপক। আমাদের মধ্যে অনেক ব্যবধান—তিনি আমাহইতে বহু উচ্চে বাস করিতেন। তাঁহার সহিত তখন তেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয় নাই। আমি দূর হইতে ভক্তি ও সম্ভ্রমের চক্ষেই তাঁহাকে দেখিতাম।

এই সময়ে কৃষ্ণনগর কলেজের বি, এ, ক্লাশ উঠিয়া গিয়াছিল। স্থানীয় লোকদিগের উদ্যোগে ও প্রিন্সিপাল লেথব্রিজ সাহেবের

উৎসাহে ১৮৭৬ সাল হইতে আবার বি, এ, ক্লাস স্থাপিত হইল। যতদিন বি, এ, ক্লাস খোলা হয় নাই অম্বিকাবাবুর 1st year ও 2nd year ক্লাসে কেমিষ্ট্রী পড়াইয়াও যথেষ্ট সময় থাকিত। তিনি স্কুল বিভাগের ১ম শ্রেণীতে Phisical Geography ও এফ, এ, ক্লাসে ইতিহাস পড়াইতেন। বি, এ, ক্লাস খোলা হইলে তিনি Philosophyও পড়াইতেন। শুধু কাজ চালান রকম পড়ান নয়, কিন্তু সুপণ্ডিতের ন্যায় পড়াইতেন। ইহাতেই তাঁহার বিদ্যার প্রসারতার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। কখন কখন পড়াইতে পড়াইতে চক্ষু বুজিতেন ও আমরা তাঁহার গম্ভীর মুখমণ্ডল দেখিয়া বুঝিতাম যে তিনি গভীর ধ্যানে ডুবিয়া গিয়াছেন। একবার লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর সার এসলী ইডেন সাহেব কলেজ পরিদর্শন করিতে আসেন ও কেমিষ্ট্রী ক্লাসে অম্বিকাবাবুর experiments দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন।

ইহার কিছুদিন পরেই ভারত গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এক একটা কৃষি বিভাগ খুলিবার প্রস্তাব করেন। এ দেশে কৃষির উন্নতিই এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। কৃষি বিভাগের কর্ত্তা (Director) হইবেন এক এক জন সিবিলিয়ান। বঙ্গের তদানীন্তন ছোটলাট সার এসলী ইডেন এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টকে বলেন যে এ দেশের কৃষির উন্নতি সাধন সিবিলিয়ানের কর্ম্ম নয়, কারণ সিবিলিয়ান সাহেবেরা এ দেশের কৃষির কথা কিছুই জানেন না। এ দেশের কৃষকেরা যতই মূর্খ হউক বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলে তাহারা চাষবাসের

কথা উত্তম জানে। যদি এ দেশের কৃষির উন্নতি বাস্তবিকই ভারত গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য হয় তবে এ দেশের লোককে বিলাতে পাঠাইয়া কৃষিবিজ্ঞান শিখাইয়া আনিতে হইবে। তাঁহারাই ফিরিয়া আসিয়া কৃষকদিগকে চাষবাসের প্রকৃত উন্নতির পথ শিক্ষা দিবেন।

ইডেন সাহেবের এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ভারতগবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারী অব ষ্টেটের অনুমতিক্রমে বঙ্গদেশে বৎসর বৎসর দুইটী কৃষিবৃত্তি স্থাপন করেন। তখন ইংলণ্ডের সিসিষ্টার (Cirencester) কলেজই বিলাতের কৃষিবিদ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলেজ ছিল। এদেশ হইতে যাঁহারা কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিতে বিলাত যাইবেন তাঁহারা সিসিষ্টার কলেজে পড়িবেন ও বৎসরে ২০০ পাউণ্ড বৃত্তি পাইবেন এই স্থির হইল।

এই বৃত্তি স্থাপিত হইলে প্রথম বৎসরেই অম্বিকাবাবু এই বৃত্তি লাভ করেন।

কিন্তু এই বৃত্তি স্থাপন করিয়া গবর্ণমেণ্ট মহা সঙ্কটে পড়িলেন। বৎসর বৎসর ২ দুজন করিয়া লোক সিসিষ্টার কলেজ হইতে প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া এ দেশে ফিরিতে লাগিলেন কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ নামে মাত্র কৃষিবিভাগ, সেখানে এ সকল লোকের কাজ কিছু নাই। ইডেন সাহেব চলিয়া গেলেন, একজন সিবিলিয়ান সাহেবই কৃষিবিভাগের ডিরেক্টার হইলেন ও তাঁহার অধীনে কখন একজন কখনও বা দুইজন মাত্র সিসিষ্টার কলেজের পাশ করা বাঙ্গালী যুবক নামে মাত্র কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন।

ইঁহাদের অনেককেই গবর্ণমেণ্ট ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বহাল করিয়া ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিতে নিযুক্ত করিলেন। এক অম্বিকাবাবু মাত্র Statutory Civilian এর পদ পাইয়াছিলেন। সিসিষ্টার কলেজে পড়িবার সময়ে তিনি এরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করেন যে উক্ত কলেজের প্রিন্সিপাল Secretary of Stateকে তাঁহার পুরস্কারের জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করেন। যাঁহারা কৃষিবৃত্তি লাভ করিয়া সিসিষ্টার কলেজে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন তাঁহাদের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

১ম বৎসর অম্বিকাচরণ সেন ও সখায়েত হোসেন
২য় " ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ও গিরীশচন্দ্র বসু
৩য় " ভূপালচন্দ্র বসু ও অতুলকৃষ্ণ রায়
৪র্থ " দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়
৫ম " নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১ জন মাত্র)
৬ষ্ঠ " দ্বিজদাস দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

তাহার পরে বৃত্তি উঠিয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে গিরীশবাবু ও ব্যোমকেশ বাবু গবর্ণমেণ্টের চাকুরী গ্রহণ করেন নাই। উভয়েরই পরিচয় অনাবশ্যক। গিরীশবাবু বঙ্গবাসী কলেজের স্বনামধন্য অধ্যক্ষ। ব্যোমকেশবাবু কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ও বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনে ভারতের অন্যতম অধিনায়ক।

অম্বিকাবাবু ইংলণ্ডহইতে প্রত্যাগত হইয়া কএকমাসের জন্য কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপনা কার্য্যে ফিরিয়া যান। এই

সময়ে তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া একটী সভা করেন। এই সভাতে তিনি বিলাতী ও এদেশী সমাজ সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র কিন্তু অতি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা পাঠ করেন। তিনি বলেন যে পতিভক্তি, সন্তানপালন, আত্মোৎসর্গ ও ধর্ম্মপ্রাণতায় ভারতরমণীই জগতের আদর্শ। এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সভায় ভদ্রলোকদিগের মধ্যে একজন চিন্তাশীল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন যে বক্তৃতাটী স্বর্ণাক্ষরে ছাপাইয়া বাঙ্গালার ঘরে ঘরে রক্ষা করিলে দেশের প্রচুর মঙ্গল হইবে।

এই সময়ে পূজ্যপাদ আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যু হয়। আমিই এই নিদারুণ শোকের সংবাদ অম্বিকাবাবুর নিকট লইয়া যাই। আমাকে দেখিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার কি অসুখ হইয়াছে? আমি নিঃশব্দে কৃষ্ণরেখাঙ্কিত Indian Mirror পত্রখানি তাঁহার সম্মুখে রাখিলাম। তিনি পড়িয়া বহুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন "কেশবচন্দ্র যে কায করিতে পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন তাহা করিয়া গিয়াছেন।" ইহার বহুকাল পরে আর একবার কেশববাবুর সম্বন্ধে তাঁর সহিত আমার কথা হয়। তিনি বলিলেন "কুচবেহার বিবাহে তিনি ভুল করিয়াছিলেন বলিতে হয় বল, কিন্তু যদি ইচ্ছা করিয়া রাজার শ্বশুর হইবার লোভে তিনি এই বিবাহ দিতেন তবে শেষজীবনে তাঁহার উপরে বিধাতার যে মহাআশীর্ব্বাদ আসিয়াছিল তাহা কখনই সম্ভব হইত না।" কথাটী কি সুন্দর! তবে যাঁহারা কেশবচন্দ্রের শেষ জীবনের মহাসিদ্ধি ও দিব্যজ্যোতি

না দেখিবেন তাঁহাদের নিকটে অম্বিকাবাবুর কথাটা অর্থহীন ভিন্ন আর কি হইবে ?

অম্বিকাবাবু Statutory Civilian হইলে প্রথম প্রথম তাঁকে কৃষিবিভাগে আসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টার করা হইল। তিনি দেখিলেন যে বিলাতের কৃষি ও এ দেশের কৃষি বড় স্বতন্ত্র সামগ্রী। বিলাতের কৃষি ধনী লোকদিগের অবলম্বন ; বলাই বাহুল্যমাত্র যে আমাদের কৃষি দরিদ্রের বৃত্তি। আমাদের কৃষির অর্থ ফসল উৎপাদন ; সে দেশের কৃষকগণও কিছু কিছু ফসল উৎপাদন করে বটে, কিন্তু মাংসের জন্য গরু, ভেড়া, শূকর প্রভৃতি পশু-পালনই তাহাদের প্রধান সম্বল। ধান, পাট, তুলা, ভুট্টা, ছোলা, অড়হর, মুগ, কলাই, সরিষা, মসিনা, তিল, ইক্ষু, তামাক প্রভৃতি ভারতের প্রধান প্রধান ফসল সেখানে আদৌ নাই। ইংলণ্ডে চাষ হয় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘোড়ার দ্বারা এবং যে সকল কৃষিযন্ত্র সেখানে ব্যবহৃত হয় আমাদের অনশনক্লিষ্ট কৃষককুলের না আছে তাহা কিনিবার পয়সা, তাহাদের অর্দ্ধমৃত বলদের না আছে তাহা টানিবার শক্তি, এবং তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে না আছে তাহা চালাইবার স্থান। তাহার পর সেখানকার মাটী, রৌদ্র, বৃষ্টি ও বায়ু এ দেশের মৃত্তিকা প্রভৃতি হইতে স্বতন্ত্র। ফসলের রোগ, ফসলের পোকা প্রভৃতিও সে দেশে ও এ দেশে এক নহে। সুতরাং তিনি দেখিলেন বিলাতের কৃষিসম্বন্ধীয় গবেষণার ফল এ দেশে ঠিক ঠিক খাটিবে না, এ দেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিগবেষণা আরম্ভ করিতে হইবে।

অনেক লোকের ধারণা যে এ দেশের কৃষককুল যে পরিমাণে মূর্খ এখানকার কৃষিপদ্ধতিও সেই পরিমাণে হেয়, ইহার আদ্যন্ত কুসংস্কারমূলক। আবার অনেক লোকের বিশ্বাস ঠিক ইহার বিপরীত। তাহাদের মতে এ দেশের কৃষকেরা নিরক্ষর বটে, কিন্তু কৃষি সম্বন্ধে পুরুষপুরুষানুক্রমে বহু শতাব্দীর সঞ্চিত অভিজ্ঞতা তাহাদের সম্বল; সকল দিক বিবেচনা করিলে এ দেশের কৃষিপ্রণালার উন্নতির পথ নির্দ্দেশ করা খুব সহজ নহে। এই দুই বিপরীত মতের কোন্‌টী সত্য এবং উন্নতি করিতে হইলে কোথায় কতটুকু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন তাহা স্থির করিতে হইলে এ দেশের কৃষি প্রণালীটা কি তাহা প্রথমেই নির্দ্ধারণ করিতে হয়। কিন্তু দেশের সর্ব্বত্রও কৃষিপ্রণালী এক নহে। সুবিস্তীর্ণ ভারতসাম্রাজ্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও এক বঙ্গদেশেই মৈমনসিং ও বীরভূমের কৃষিপ্রণালীতে কত প্রভেদ। সেই জন্য ইডেন সাহেব প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে কৃষিবিভাগ হইতে কতকগুলি জেলার প্রচলিত কৃষিপদ্ধতি লিপিবদ্ধ করা হোক। এই আদেশানুসারে অম্বিকা বাবু বর্দ্ধমান ও ঢাকার কৃষিরিপোর্ট লেখেন। এই দুইখানিই বহু পরিশ্রমের নিদর্শন, ও অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহার পরে ভূপালবাবু রাচী ও পালামৌ জেলার কৃষিরিপোর্ট লেখেন ও নগেন্দ্রবাবু কটকের কৃষিরিপোর্ট লেখেন। ইঁহারা যে রিপোর্ট লেখেন তাহাতে অম্বিকাবাবুরই প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণ করিয়াছিলেন।

কৃষি সম্বন্ধে গবেষণার জন্য তিনি বহু চেষ্টা ও বহু যত্ন করিয়া শিবপুর, বর্দ্ধমান ও ডুমরাঁওতে তিনটী কৃষিপরীক্ষাক্ষেত্র স্থাপন

করেন। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে তৎকালে গবর্ণমেণ্টের কৃষির উন্নতি বিষয়ে কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। ডুমরাঁওএর কৃষি পরীক্ষাক্ষেত্রের সমস্ত ব্যয় তত্রত্য মহারাণী দিতে সম্মত হইলেন, বর্দ্ধমানের পরীক্ষাক্ষেত্রের সমস্ত ব্যয়ভার মহারাজার ষ্টেটের উপরে ন্যস্ত হইল, গবর্ণমেণ্ট শিবপুর পরীক্ষাক্ষেত্রের ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন বটে কিন্তু পনর টাকা বেতনের একজন ওভারসিয়ারের উপরে ইহার পর্য্যবেক্ষণের ভার অর্পিত হইল! হাসিও আসে কান্নাও পায়। এই তিন স্থানেই পরীক্ষার প্রণালী অম্বিকাবাবুই নির্দ্দিষ্ট করেন।

কৃষিবিভাগে কিছুদিন কায করার পরে অম্বিকাবাবুকে সেটেলমেণ্টের কাযে নিযুক্ত করা হয় ও অবশেষে তাকে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও সেসন জজ করা হয়। তাঁহার জীবনের এই অংশের সহিত আমার বিশেষ পরিচয় নাই, কিন্তু কৃষি বিভাগ হইতে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা বঙ্গদেশের পক্ষে একটী মহা দুর্ভাগ্যের কারণ। তিনি কৃষ্ণবর্ণ না হইলে কৃষি বিভাগের ডিরেক্টার হইতেন এবং এ দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেন তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যখন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে Statutory Civilian নিযুক্ত করেন তখন ইণ্ডিয়ান মেষণ পত্র রঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন "The next time we shall hear of an engineer made Lord Bishop of Calcutta," অর্থাৎ "এইবার আমরা নিশ্চয় শুনিব যে গবর্ণমেণ্ট একজন ইঞ্জিনিয়ারকে কলিকাতার লাট পাদরী নিযুক্ত করিলেন।"

অম্বিকাবাবুর জীবন কর্ম্মবহুল ছিল না। তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়া তাঁহার হৃদয়মনের একটী চিত্র অঙ্কিত করা বড় কঠিন। তিনি সরকারী চাকুরী করিতেন ও অবসরকাল দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনায় অতিবাহিত করিতেন। তিনি অতিশয় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন ও যখন যে কর্ম্মের ভার লইতেন শরীর ও মনের সমগ্র অধ্যবসায় দিয়া তাহা পালন করিতেন। তাঁহার প্রকৃতি ছিল বিনম্র শিষ্য-প্রকৃতি, তাঁহার জীবন ছিল একাগ্র সাধকের জীবন। তিনি বাগ্মী ছিলেন না, বস্তুতঃ অল্পভাষী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিকটে বসিলে অনেক নূতন কথা শুনিতাম। তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে হৃদয়মন পবিত্র হইত।”

শাসন কার্য্য।

তিনি বিলাত হইতে কৃষি বিদ্যার পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষার ফলে দেশের কৃষির উন্নতি হইবে, দেশ লাভবান হইবে ইহাই আশা করা গিয়াছিল। উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলে তাহা হইতও। গবর্ণমেণ্ট যেরূপ কার্য্য-প্রণালী স্থির করিয়া তাঁহাকে বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন তাহার পরিবর্ত্তন হওয়াতেই তাঁহার উপযুক্ত ক্ষেত্র মিলিল না। কৃষি বিদ্যার পণ্ডিতকে অবশেষে গবর্ণমেণ্ট শাসন বিভাগে নিয়োজিত করিলেন।

সিবিল সার্ব্বিসে প্রবেশাধিকার পাইয়া তাঁহাকে প্রথম কয়েক বৎসর কখনও শাসন বিভাগে কখনও বা কৃষি বিভাগে



স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ সেন

কাজ করিতে হইয়াছে। পরে তিনি স্থায়ীরূপে শাসন বিভাগে নিযুক্ত হন।

কটকে কিছুদিন জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিবার পর তাঁহার উপর তথাকার সেটেলমেণ্টের ভার পড়ে। এই কার্য্য অত্যন্ত শ্রমসাধ্য। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কার্য্য করিতে হয়। কটকের পল্লীতে তাঁবু ফেলিয়া তাঁহাকে অনেক সময় তথায় বাস করিতে হইত।

তিনি এমন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন যে কর্ত্তব্য কার্য্যে আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন। অতিরিক্ত শ্রমে অবশেষে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি সেটেলমেণ্ট হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্টে প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। এইরূপ প্রর্থনায় উপরিস্থ কর্ম্মচারীর বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিল। কারণ সেটেলমেণ্টে প্রবেশ করিলে প্রায় কেহ অন্য কাজে যাইতে চায় না। এই কার্য্যে প্রচুর এলাউন্স আছে। ইহার পর তাঁহাকে কিছুদিন পুরীতে ম্যাজি-ষ্ট্রেটের কার্য্য করিতে হইয়াছিল।

কটকে থাকিয়াই অম্বিকাচরণ জজের পদে মনোনীত হন। তিনি কৃষি বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া যখন জজের পদে মনোনীত হইলেন তখন তাঁহার বড় চিন্তা হইয়াছিল, কি জানি বিচার বিভ্রাট ঘটে। ধর্ম্মভীরু লোকের এরূপ চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক। এজন্য কঠিন পরিশ্রমে ভাল করিয়া আইন অধ্যয়ন করেন। তিনি অত্যন্ত ধীর ও সুবিবেচক লোক ছিলেন। যখন যে কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইতেন অতি নিষ্ঠার সহিত তাহা সম্পন্ন

করিতেন। তদুপরি তাঁহার স্থির ধর্ম্মবুদ্ধি ছিল, আপনার বুদ্ধি বিবেচনা ও শ্রমে যতদূর সম্ভব তাহা করিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। উপর হইতে কি আলো পাওয়া যায় তাহারই জন্য প্রার্থনা করিতেন। বিচারক্ষেত্রে প্রার্থনা তাঁহার নিত্য সহায় ছিল। মহা বিচারকের কি অভিপ্রায় তাহা বুঝিবার জন্য প্রার্থনা না করিয়া তিনি কখনও বিচারাসনে বসিতেন না। গুরুতর মোকদ্দমার সময় ভাবনা চিন্তায় তাঁহার রজনী অনিদ্রায় কাটিত, আর বারবার ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিতেন। এই ভাবে চলিয়া তিনি একজন যথার্থ ন্যায় বিচারকরূপে গণ্য হইয়াছিলেন। সাধারণে এবং সরকারে সুবিচারক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি হইয়াছিল। উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণের অনেকে তাঁহার গুণে এমন মুগ্ধ ছিলেন যে শেষ জীবন পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে বন্ধুতা রক্ষা করিয়াছিলেন।

ন্যায় অন্যায় বিচারহীন হইয়া যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের মন রঞ্জনে প্রয়াসী হন তাঁহাদের সম্মুখে অম্বিকাচরণ এই শিক্ষা রাখিয়া গিয়াছেন ন্যায় বিচার দ্বারাই গবর্ণমেণ্টের যথার্থ প্রশংসাভাজন হওয়া যায়।

তিনি যখন কটকে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন একজন অপরাধীর ফাঁসীর হুকুম হয়। তাঁহার উপর ফাঁসীর আদেশ পূরণের ভার ছিল। ঐ দিন রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হয় নাই। রজনীর অধিকাংশ সময় প্রার্থনায় যাপন করিয়াছিলেন। দণ্ডিত ব্যক্তিকে আদেশ শুনাইবার সময় করুণ স্বরে সহানুভূতির সহিত

বলিয়াছিলেন তোমার শেষ সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তোমার যাহা ইচ্ছা বলিতে পার। সে ব্যক্তি পুরীর মহাপ্রসাদ খাইতে চাহিল। তিনি পুরীতে লোক পাঠাইয়া মহাপ্রসাদ আনাইয়া তাহাকে খাইতে দিলেন; এবং বলিলেন ঈশ্বরকে স্মরণ কর, তিনিই মানবের চিরকালের সম্বল। যিনি আপনাকে মহা বিচারকের অধীন মনে করেন অপরের বিচারকালে তাঁহাকে এমনই ভাবনাযুক্ত হইতে হয়।

ন্যায় দৃষ্টি।

ন্যায়ের প্রতি সতত তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল, কখনও ন্যায় পথহইতে একচুল বিচলিত হইতেন না। ময়মনসিংহে একজন কর্ম্মচারীর ঘুষ লওয়ার কথা তাঁহার কাণে আসিয়াছিল। তিনি তাহার শাসনের ব্যবস্থা করিলে ঐ ব্যক্তি তাঁহার ঘোর শত্রু হইয়াছিল। ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে চিঠি লিখিয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্মাবহ ঈশ্বরে যাঁহার বিশ্বাস এই প্রকার শত্রুর ভয়ে তাঁহাকে আর কি বিচলিত করিবে?

কাছারীতে যথাসময় উপস্থিত হওয়ার প্রতি তাঁহার প্রতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। কখনও বিলম্ব করিতেন না। বরং নির্দ্দিষ্ট সময়ের একটু পূর্ব্বে যাইতেন। সময় সম্বন্ধে তাঁহার এই প্রকার নিয়ম দেখিয়া সময় সময় নিম্নস্থ কর্ম্মচারীগণ তামাসা করিয়া বলিতেন জজ সাহেবের Punctualityর জ্বালায় আমরা ভাল করিয়া পেট পূরিয়া খাইয়া যাইতে পারি না।

সজ্জন বলিয়া প্রশংসা পাইয়াছেন। কি দেশীয় কি বিদেশীয় সকলের মুখেই তাঁহার সুখ্যাতি শুনা গিয়াছে।

তাঁহার প্রতি লোকের কিরূপ ভাব ছিল ময়মনসিংহের বিদায়-সভার সঙ্গীত ও ক্ষুদ্র কবিতার উল্লেখ করিয়া তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। এইরূপ বিদায়সভা এবং কৃতজ্ঞতা ও দুঃখ প্রকাশ সকল স্থলেই হইয়াছে।

ভক্তি প্রেম উপহারে পূজিতে শ্রীঅম্বিকায়
মিলেছে সব ভক্তগণ, আজিকার এ সভায়।
বঙ্গের দুর্লভ মণি অসীম বিদ্যার খনি,
দয়াধর্ম্ম শিরোমণি এহেন আছে কোথায়।
উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, সদারত পরহিত,
সর্ব্বজনে বিমোহিত, তোমার সৌজন্যতায়।
শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করি যাবে যদি পরিহরি
প্রীতি মাল্য গলে পরি, এস সখা লও বিদায়।
এই ভিক্ষা বিভুপায়, সুখে দিন যেন যায়
সুস্থ থাক মন কায় পূর্ণ ধরা যশাভায়।

ফুটিলে কুসুম বনে চৌদিকে সুবাস বয়,
গুণ গায় অলিকুলে, এ কিছু বিচিত্র নয়।
জগতের রীতি এই, গিরি শিরে উঠে যেই,
নিম্ন জীবে দেখে সেই, ধরাসনে ধরাশ্রয়।

মহামতি যেই জন, যাঁতে উচ্চ মান রয়,
তাহার এ ভ্রমোদয়, হইলেও স্থায়ী নয়।
এহেন সাধুরে হায়, ভাগ্যফলে কভু পায়,
কিন্তু আজি ছাড়ি যায়, ভাবিতে কান্দে হৃদয়।
যথা যাও সুখাসনে, থাক সদা প্রিয় মনে,
এ রোদন রেখ মনে, তুমি সাধু সদাশয়।

যাও, নয়ন অন্তরে রাখিব তোমারে
অন্তর-অন্তরে যতনে।
ওহে, নয়ন মেলিয়ে নাহি দেখি যদি
দেখিব মিলিত নয়নে।
তব, ধীর উদার মধুর মুরতি
রাজিবে হৃদয়-নয়নে।
ওহে, দিব নিতি নিতি, সোহাগ সম্প্রীতি
চর্চ্চিত প্রেম-চন্দনে।
তুমি গৌরবে উজলি, সৌরভে উছলি
আছিলে ধরম জীবনে।
ছিলে, দয়ায় কোমল, যেন নবনীত
কঠিন দুরিত দমনে।
তাই, বিদায়ে তোমার দেখ শতধারে
অশ্রু বরিষে সঘনে।

এস এস প্রিয়তম আজি একবার
এস এ বাহু বন্ধনে।

বর্দ্ধমানে দ্বিতীয়বার কার্য্যকালে তথাকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পুণ্য-চরিত্র ভক্ত প্রকাশচন্দ্র রায়ের সঙ্গে তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুতা জন্মে। সংসারে থাকিয়া যথার্থ ধর্ম্মজীবনের দৃষ্টান্ত ইঁহাদের দুই জনের জীবনেই সম্যক্ পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং তঁহাদের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুতা স্বাভাবিক। এই বন্ধুতার ফলে অবশেষে তাঁহাদের মধ্যে পারিবারিক সম্বন্ধের সূচনা হইল। প্রকাশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে অম্বিকাচরণের একমাত্র কন্যার পরিণয় হইল।

অম্বিকাচরণের শেষকার্য্যস্থল রাজসাহী। এখানে দারুণ বহুমূত্র রোগের প্রকোপে তিনি কর্ম্মহইতে অবসর গ্রহণ করেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ১৯০৬ সনে তিনি অবসর লইলেন। এই দীর্ঘকাল নানা স্থানে নানা প্রকৃতির লোকের সংসর্গে তাঁহাকে আসিতে হইয়াছে। কিন্তু আপনার আদর্শ ও লক্ষ্য হইতে কখনও বিচ্যুত হন নাই।

অধ্যাপনা সময়ে ছাত্রগণকে যে উপদেশ দিতেন আজীবন সেই উপদেশ মত নিজে চলিয়াছেন। সেটি এই—"যখন যে কাজ করিবে তখন সেই কাজ ছাড়া জীবনের আর সকল কথা ভুলিয়া গিয়া তাহাতেই মন-প্রাণ ঢালিয়া দিবে, যেন সে কাজ

ছাড়া জীবনে তোমার আর কোন কাজ নাই।" এই মন্ত্রটি তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রের উন্নতির প্রধান সহায় হইয়াছিল।

আদর্শে দৃষ্টি।

যৌবনের প্রারম্ভে ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া অম্বিকাচরণ বিশ্বাস ও ভক্তির পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কর্ম্মক্ষেত্রের বিচিত্রতার মধ্যে এই পথে স্থির থাকা বড়ই কঠিন। ন্যায়, সত্য, প্রেম, ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে জীবন পরিচালন অত্যন্ত দুরূহ। এমন কত স্থানে পড়িয়াছেন যেখানে সম-বিশ্বাসীর সাক্ষাৎ পান নাই, বিরুদ্ধভাব ও মতের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। কিন্তু তবু ঈশ্বরে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। উপাসনা, প্রার্থনা, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও ধর্ম্মালোচনা যাহা বিশ্বাস ও ভক্তিপথের অনুকূল নিত্য তাহার অনুষ্ঠান করিয়া যাইতেছিলেন। ইহাতেই কর্ম্মক্ষেত্রেও ধর্ম্মজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল। ফলতঃ, অনন্যমনে যিনি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন—ঈশ্বর তাঁহার ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের স্রোত তিনিই খুলিয়া দেন। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের আর একটু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পারিবারিক জীবন।

অম্বিকাচরণ যেমন স্কুলে ও কর্ম্মক্ষেত্রে আদর্শ জীবন যাপন করিয়াছেন তেমনি তাঁহার পারিবারিক জীবনও আদর্শ স্থানীয় ছিল।

বাল্যকাল হইতে প্রকৃতি গুণে পরিবারের এবং জন্মভূমির রত্ন ছিলেন। মাতার আদর্শ সন্তান বলিলে যাহা বুঝায় লোকে তাঁহাকে তাহাই জানিত। মাতার দুঃখ ব্যথা, তিনি অনুভব করিতেন। মাতৃভক্তিতে এমন অনুপ্রাণিত ছিলেন যে মার নাম করিতে চক্ষে জল আসিত। পরে মাতা পুত্রে ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতান্তর সত্বেও পরস্পরের প্রতি ভাবের ব্যত্যয় কখনও ঘটে নাই।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করেন। শ্রদ্ধা দিবার এবং ভালবাসিবার যে অপূর্ব্ব শক্তি ঈশ্বর তাঁহাকে দিয়াছিলেন তদ্দ্বারাই তিনি দাম্পত্য জীবনে যথার্থ সুখী হইয়াছিলেন। ইহাতে পত্নীরও গভীর ভালবাসা লাভ করেন। তিনি পত্নীকে ধর্ম্ম পথের সহায় জানিতেন। তাঁহার সঙ্গে অনন্তকালের সম্বন্ধ, পরকালেও একত্র হইয়া ভগবানের পথে অগ্রসর হইবেন, ইহাই বিশ্বাস করিতেন।

পত্নীর প্রতি কিরূপ পবিত্র সম্পর্ক অনুভব করিতেন নিম্ন-

লিখিত কয়েক পংক্তিতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। "তোমার মুখ দেখিয়া হৃদয় পবিত্র করি, সরল ও সবল করি। দুইজনে মিলিয়া প্রেমের উৎস, সৌন্দর্য্যের উৎস যিনি তাঁর নিকটে প্রণত হই। এমন হইলে কোথায় থাকে সংসারের কষ্ট আর কোথায় থাকে মৃত্যুভয়।"

পত্নীর প্রতি গভীর ভালবাসা সত্বেও একস্থলে লিখিয়াছেন—"আমাদের মধ্যে প্রেম ও সংযোগ যতদূর তিনি দেখিতে চান তাহার শতাংশের একাংশও হয় নাই। স্বামীস্ত্রীর পবিত্র প্রেমে তাঁর (ঈশ্বরের) প্রেমজ্যোতি পড়িলে যে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের আবির্ভাব হয় আমরা যেন তাহাই লাভ করি।"

পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্যের কখনও ত্রুটি হইতে পারিত না। ১৮৮৯ সনে যখন কটকে সেটেলমেন্টের কর্ম্মে ছিলেন তখন পত্নী কঠিন পীড়িতা হন। সরকারী কর্ম্মে অনবসর বশতঃ তিনি সর্ব্বদা পত্নীর নিকট থাকিতে পারিতেন না, কিন্তু সেবা ও চিকিৎসার কোন ত্রুটি হইতে পারে নাই। সিভিল সার্জ্জনের উপর চিকিৎসার ভার ছিল, একজন ব্রাহ্ম নেটিভ ডাক্তার গৃহে রোগিনীর তত্ত্বাবধান করিতেন। সমস্ত দিনের শ্রমের পর তিনি মফস্বল হইতে পালকি করিয়া আসিয়া প্রতিদিন পত্নীকে দেখিয়া যাইতেন।

পরিবারের প্রতিজনকেই প্রেম ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। কন্যাকে মা বলিয়া ডাকিতেন। শিশুকাল হইতে কন্যার মনে ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নিজে শিশু

সাজিয়া শিশুর ভাষায় কন্যাকে যে সকল ক্ষুদ্র পত্র লিখিতেন উহার মধ্য দিয়া যে তাঁহার শুদ্ধ মনের ছায়া প্রতিফলিত হইত তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। জামাতাকে পুত্রসম স্নেহ করিতেন।

১৯০২ সনে তিনি যখন বাঁকুড়া ছিলেন তখন তাঁহার একমাত্র কন্যার প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করে। যিনি শিশু ছিলেন তিনি মা হইলেন, ভগবৎ-আশীর্ব্বাদ রূপে গৃহে নূতন লোকের আগমন হইয়া আনন্দবৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত হইল। ক্রমে শিশুর বয়স বাড়িল, কথা বলিতে আরম্ভ করিল। অম্বিকাচরণ লিখিলেন—"দিদিমণি কথা শিখিতেছেন, সাবধান যেন কোন মন্দ কথা না শেখে, ঈশ্বর প্রদত্ত জিহ্বার অপব্যবহার না হয়।" ভালবাসা এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধি এই উভয় দিক উজ্জ্বল থাকায় পরিবারের কোন ক্ষুদ্র ব্যাপারও তাঁহার দৃষ্টিকে অতিক্রম করিতে পারিত না।

বন্ধুদের সঙ্গে কিরূপ অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল তাহার সাক্ষ্য তাঁহার বন্ধুগণ অদ্যাপি দিয়া থাকেন। যৌবনের প্রারম্ভে [illegible] যাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সঙ্গে সর্ব্বদা যোগ অনুভব করিতেন। সে যোগের অদ্যাপি বুঝি বিরাম হয় নাই। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়কে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। শ্রীযুক্ত বঙ্গবাবুর মুখে সর্ব্বদা তাঁহার গুণের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ঢাকার শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, ঈশানচন্দ্র সেন, দুর্গানাথ রায় প্রভৃতি প্রচারকগণ তাঁহার সহোদরতুল্য ছিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গ

করিতে, একত্র বসিয়া আহার করিতে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেন। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সেন ৺কেদারনাথ রায় মহাশয়-গণের সঙ্গে গভীর ধর্ম্ম সম্পর্ক ছিল। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ, ভাই কান্তিচন্দ্রের প্রতি অপরিসীম ভক্তি পোষণ করিতেন। দেখা হইলে ইঁহাদের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতেন।

আপনার সুমিষ্ট ব্যবহারে তিনি পরকে আপনার করিতে পারিতেন। কৃষ্ণনগরের এক পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। বর্দ্ধমানেও এক পরিবারে এমনই ভাব ছিল। তথাকার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মিত্রের মাতা তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। বাড়ীর কন্যা বধূরা তাঁহাকে দেখিলে কত আনন্দ প্রকাশ করিতেন। তিনি বদলী হইয়া দ্বিতীয় বার বর্দ্ধমান আসিতেছেন শুনিয়া অবিনাশবাবুর মাতা "আমার অম্বিকা" বলিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কটকের সাধুচরিত্র মধুসূদন রাও মহাশয়ের তাঁহার প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল, মধুবাবুর পত্রে তাহার আভাস পাওয়া যায়। মধুবাবু লিখিয়াছেন—"আমি ঈশ্বরের নিকট একান্ত কৃতজ্ঞ যে সেন মহাশয়ের মত ভ্রাতা ও বন্ধু লাভ করিয়াছিলাম। তাঁহার স্বভাব পূর্ব্বকালীন ঋষিদের মত ছিল। যিনিই তাঁহাকে জানিতেন তিনিই তাঁর জ্ঞানের অনুশীলন, চিন্তাশীলতা, বন্ধুগণে ঐকান্তিক প্রীতি, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল বিষয়ে ঈশ্বরে প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস দেখিয়া মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইতেন।" "আমি তাঁহার নিকট কত ঋণী তাহা ভাষায় ব্যক্ত হইবার নয়। তাঁহার

ঋষি-প্রাণের সঙ্গে এ ক্ষুদ্র জীবনের সংস্পর্শ সংঘটনে আমি যে অমৃত আস্বাদন করিয়াছি তাহা চিরদিন আমার স্মৃতিকোষের অমূল্য নিধিরূপে সংরক্ষিত থাকিবে।”

রঙ্গপুরের রাজা গোবিন্দলাল তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। পূজার সময় রাজবাড়ীতে মহা ধূমধাম ও ভোজ হইত। কিন্তু অম্বিকাচরণ পূজার সময় তথায় থাকিতেন না বলিয়া রাজার ইচ্ছায় পূজার পূর্ব্বেই বিশেষ ধূমধাম ও ভোজের আয়োজন হইত। তাঁহাকে সুখী করিবার রাজার এমনই আগ্রহ ছিল।

কেবল পদস্থ সম্মানিত ব্যক্তিদের সঙ্গেই প্রীতি ছিল এমন নয়। ভৃত্য, চাপরাশী, ঝি কি অন্য যে কেহ কর্ম্মসূত্রে তাঁহার সংস্পর্শে আসিত, মুগ্ধ হইত। অধীনস্থ কাহারও প্রতি কখনও তিরস্কার কি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেন না।

দার্জ্জিলিংএ বাড়ীর পাচকের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহার পত্নী শাসনের জন্য তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি পাচককে ডাকাইয়া মৃদুভাবে কেবল বলিলেন—“দেখ, তুমি বড় বেড়ে উঠেছ। কিন্তু সকল বিষয়েরই একটা সীমা আছে।” এই বলিয়া ভৃত্যকে আপন কাজে যাইতে অনুমতি করিলেন, আর কিছুই বলিলেন না। কিন্তু ভৃত্য তাহাতেই সাবধান হইল। এইরূপ দুইএকটি সাধারণ কথা তাঁহার শাসনের অস্ত্র ছিল। রাগারাগি তর্জ্জন গর্জ্জন একেবারেই মুখে আসিত না। প্রেম ও সদ্ব্যবহারের বল কর্কশ ব্যবহার

অপেক্ষা কোন অংশে [illegible] নহে তাঁহার কার্য্যে ইহাই প্রমাণিত হইত।

কটকে তাঁহার বাড়ীর ঝি তাঁহার পত্নীর নিকট এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল যে একদিন সাহেবকে আপনার বাড়ীতে আনিয়া রন্ধন করিয়া খাওয়াইতে চায়। অম্বিকাচরণ ঝির আকাঙ্ক্ষার কথা পত্নীর নিকট শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং ঝিকে সুখী করিবার জন্য তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। ঝি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আপনার ক্ষুদ্র কুটীরে পাইয়া সন্তানতুল্য স্নেহে আহার করাইল। উচ্চ আসনে থাকিয়া সামান্য ঝির প্রতি এরূপ ব্যবহার কয়জনে দেখাইতে পারে?

কটকে সেটেলমেন্টের কার্য্যের সময় তাঁহাকে পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিতে হইত। গ্রামের দরিদ্র গৃহস্থদের ক্লেশ দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইতেন। সঙ্গে ঔষধ রাখিতেন প্রয়োজন মত দরিদ্র-দিগকে দিতেন। গরীব গৃহস্থ তাঁহার মুখে সহানুভূতি ও সমবেদনার কথা শুনিয়া কৃতজ্ঞতায় গলিয়া যাইত। কখন কখন পল্লীর বালকদের একত্র করিয়া মিষ্টান্ন বিতরণ করিতেন।

কটকের কোন পল্লীর এক পাগলিনীকে একবার ভাল করিয়া-ছিলেন। ঐ স্ত্রীলোকটি অনেক সময় তাঁহার তাঁবুর নিকট আসিত এবং বিড় বিড় করিয়া কি যেন বলিত। তিনি চাপরাশীদ্বারা অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন উহার একটি কন্যার জন্য মনে ব্যথা আছে। ইচ্ছাসত্বেও কন্যাকে কিছু দিতে পারে না। অম্বিকা-চরণ উহাকে একখানি নূতন কাপড় ও কিছু মিষ্টান্ন দেওয়াইলে

সে উহা লইয়া আনন্দে কন্যাকে দিয়াছিল। তাহার পর ক্রমে তাহার স্বাভাবিক অবস্থা উপস্থিত হয়।

তিনি রাজসাহীতে সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর লইয়া চলিয়া আসিবার সময় তথাকার চাপরাশীরা তাঁহার জন্য কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিল। বলিয়াছিল, আমরা এমন সাহেব কখনও পাইব না। কত সাহেবের অধীনে কাজ করিয়াছি কিন্তু এমন ব্যবহার কাহারও নিকট পাই নাই।

কটকে অবস্থানকালে একব্যক্তি তাঁহার নিকট ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা বিক্রয় করিত। ঐ ব্যক্তির তাঁহার প্রতি এমন সদ্ভাব জন্মিয়াছিল যে বহু বৎসর পরে অবসর সময়ে পীড়ার জন্য ওয়ালটেয়ার যাত্রাকালে কটকে গাড়ীতে তাঁহাকে দেখিয়াই পরিচিত জনের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিল। তাঁহার পত্নী ঐ ব্যক্তিকে এইরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিয়াছিল কটকে সাহেবকে কাগজ দিত এবং সাহেবের অত্যন্ত স্নেহ পাইয়াছিল। সামান্য কাগজ-বিক্রেতা—যাহার সঙ্গে তাঁহার কোন যোগ ছিল না—তাহাকেও তিনি অমায়িকতায় বশীভূত করিয়াছিলেন।

মিউনিসিপাল মার্কেটে সচরাচর যে সব লোকের নিকট জিনিষপত্র কিনিতেন তাহারা তাঁহার ব্যবহারে এমন সন্তুষ্ট ছিল যে কখনও তাঁহার সঙ্গে অন্যরূপ ব্যবহার করিত না। ঐ মার্কেটে একদিন একব্যক্তির নিকট নোট ভাঙ্গাইতেছিলেন। সে ব্যক্তি তাঁহাকে সটান হইয়া প্রণাম করিল, যেন কত পরিচিত

ও আপনার জন। [illegible] সকলে দেখিয়া অবাক হইলেন। শুনিলেন দোকানের জিনিষপত্র কেনা লইয়াই পরিচয়।

তাঁহার পরলোকগমনের পর তাঁহার পত্নীর নিকট একজন মাখনওয়ালা একদিন তাঁহার কথার উল্লেখ করিয়া কত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছিল। ক্ষুদ্র দোকানদারদের সঙ্গে লোকে প্রায়ই কর্কশ ব্যবহার করে। তাহাদের বঞ্চিত করিয়া কিছু লইতে পারিলে আপনাকে লাভবান মনে করে। অম্বিকাচরণের ব্যবহার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তিনি বরং তাহাদের লাভের প্রতিই দৃষ্টি করিতেন। ভাল জিনিষই তিনি চাহিতেন, তারজন্য দুইএক পয়সা বেশী দিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। ইহাতে দোকান-দারগণ তাঁহাকে ভাল জিনিষ দিত ও ভাল ব্যবহার করিত।

লোকের দুঃখ অভাবের কথা শুনিলে তাঁহার প্রেমপ্রবণ হৃদয় গলিয়া যাইত। এজন্য কাহারও বিপদের কথা শুনিলে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। নিজের সুখের জন্য ব্যস্ত হইতেন না। পরদুঃখ মোচনের কিরূপ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন তাঁহার লিখিত কোন পত্র হইতে তাহার আভাস দিতেছি;—

“আমার একটি বন্ধুর ভ্রাতা অসুস্থ। অত্যন্ত কাতর, তাহাতে অর্থকষ্ট। তাঁহাকে আপাততঃ ২০৲ টাকা পাঠাইলাম। কিন্তু ইহাতে কি হইবে। ডাক্তারকে প্রতিবার ৪৲ টাকা ফি দিতে হয়। তবু বুদ্ধিহীন মানুষ অনাবশ্যক ব্যয় করিতে চায়। সতীশ বাবু চারি ঘোড়ার গাড়ীতে যান, যদি বল তোমার প্রতিবেশী অনাহারে মরিতেছে, তুমি এরূপ কর কেন? উত্তর এরূপ না

করিলে ভদ্রলোকের মান থাকে না। শ্রীমতী শরৎকুমারী গহনার ভারে আনত। যদি বল আপনার খেলার সাথী বিধবা হইয়াছে। একে স্বামীশোক তাহাতে পুত্র দুইটিকে মোটা ভাত কাপড় দেয় এমন সংস্থান নাই। আপনি একখানি গহনার ভার কমাইয়া একটু সাহায্য করুন। উত্তর, গহনা কমাইলে নিমন্ত্রণে কেহ জিজ্ঞাসা করে না। অতএব অর্থ দ্বারা সুখ চাও। অন্যের সাহায্য করিতে চাও না। নিজে সুখশয্যায় নিদ্রা যাও, পাশের ঘরে দরিদ্র মশার কামড়ে অস্থির হইলে কর্ণপাত কর না।"

অপরের ক্লেশের কিঞ্চিৎ লাঘব করিতে পারিলে তিনি পদমর্য্যাদা ভুলিয়া যাইতেন। একবার ঢাকার নববিধান সমাজের বার্ষিক উৎসবে সমস্তদিনব্যাপী উৎসবের পর রাত্রিতে বাড়ী ফিরিবার জন্য একখানি গাড়ী করেন। শাশুড়ী, মাসশাশুড়ী, পত্নী সহ গাড়ীতে উঠিতেছেন এমন সময় দেখিলেন শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সেন মহাশয় দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার পায়ের আঙ্গুলে ক্ষত থাকায় চলিতে অক্ষম ছিলেন। দেখিয়াই অম্বিকাচরণ গাড়ী হইতে নামিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে উঠাইলেন এবং নিজে গিয়া গাড়ীর পিছনে দাঁড়াইলেন। তখন তিনি Assistant Director of Agriculture. তাঁহাকে গাড়ীর পিছনে দাঁড়াইতে দেখিয়া তাঁহার শাশুড়ী অবশেষে কন্যাকে ক্রোড়ে বসাইয়া তাঁহাকে ভিতরে স্থান করিয়া দিলেন। তিনি পদস্থ হইয়াও পদমর্য্যাদা ভুলিয়া যাইতেন, সম্মানাস্পদ হইয়াও সম্মানকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, এ সকল ক্ষুদ্র ঘটনা তাহারই নিদর্শন।

একবার একটি দরিদ্র খৃষ্টানকে একটি দামী কোট দিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি রাস্তায় বাহির হইলে পুলিষ কর্ত্তৃক ধৃত হয়। পুলিষের বিশ্বাস হয় নাই, এমন একটি দামী কোট কেহ তাহাকে দান করিয়াছে। অবশেষে ঐ ব্যক্তি পুলিষকে লইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া নিষ্কৃতি লাভ করে।

তিনি দানে কুণ্ঠিত ছিলেন না। যে কেহ কাতর ভাবে প্রার্থী হইলে তাহাকেই কিছু দিতেন। ইহাতে সময় সময় অপাত্রে দেওয়া না হইত এমন বলা যায় না। এজন্য অনেক সময় পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দিতেন। অনেক অনাথা বিধবা, দরিদ্র ছাত্র তাঁহার সাহায্যে মানুষ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার সকল কাজ যেমন নীরবে নির্ব্বাহ হইত, দানও নীরবে করিতেন। কেহ জানিতে পারিত না। সময় সময় সৎকার্য্যে তাঁহার সাহায্য না পাইয়া কেহ কেহ তাঁহাকে ব্যয়কুণ্ঠ মনে করিতেন। কিন্তু তাঁহারা যখন তাঁহার নীরব দানের পরিচয় পাইতেন তখন আর পূর্ব্বের ভাব থাকিত না। নীরবে আপন মনে কাজ করিয়া যাওয়াই তাঁহার প্রকৃতিগত ভাব ছিল।

প্রচারক ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের খাওয়াইতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। বেতন বৃদ্ধি কি অন্য যে কোন উপলক্ষে সময় সময় তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। কিন্তু যেমন তেমন করিয়া খাওয়াইয়া সুখী হইতেন না। নিজের পছন্দ মত দ্রব্য ও পত্নীর সুরন্ধন করা আহার্য্য না হইলে তৃপ্তি বোধ করিতেন না। এজন্য নিজে বাজারে যাইতেন এবং নানা স্থান ঘুরিয়া যেখানে যে

জিনিষ ভাল পাওয়া যায় দেখিয়া শুনিয়া আনিতেন ও পত্নীকে স্বহস্তে রন্ধন করিতে বলিতেন।

ধর্ম্ম জীবন।

ধর্ম্মজীবনের মাধুর্য্যেই অম্বিকাচরণের যথার্থ পরিচয়। তাঁহার ধর্ম্মজীবন যেমন কর্ম্মের পথ দিয়া, পারিবারিক জীবনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে, তেমনি উহাতে জ্ঞানেরও অত্যন্ত প্রভাব ছিল। জ্ঞানের অনুশীলন তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞানের সুনিশ্চিত পথে তাঁহার ধর্ম্মজীবন পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। ইহাতেই আমরা দেখিতে পাই, যেমন প্রবীণ বয়সে তেমনি বাল্যের ক্রীড়াপ্রবণতা এবং যৌবনের উদ্দাম উৎসাহের সময়েও জ্ঞানের অনুশীলনে তাঁহার তদ্গত ভাব। যেন আজীবন ছাত্রের ন্যায় জ্ঞানসঞ্চয়ে ম[illegible]যোগী ছিলেন। প্রবীণ বয়সে কর্ম্মক্ষেত্রের কঠিন পরিশ্রমে[illegible] মধ্যেও, তাঁহার প্রিয় গ্রন্থাবলীতে ছাত্রের ন্যায় এমন পরিশ্রম ও মগ্নভাব ছিল যে, দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইত।

তিনি এই ভাবে নিজকে শিক্ষিত করিয়াছিলেন যে, নিজের মনের সঙ্গে যতক্ষণ না সায় পাইতেন ততক্ষণ অন্যের মত গ্রহণ করিতেন না। অর্থাৎ কোন বিষয় বুঝিতে হইলে, একেবারে তলাইয়া সুন্দররূপে যতক্ষণ না বুঝিতেন, ততক্ষণ ছাড়িতেন না। ইহার জন্য অনেক পরিশ্রম, যাহা অন্যে বৃথা পরিশ্রম মনে করিতে পারেন, তাহাও নিজে হাতে করিতেন। অথচ তাঁহার শিক্ষা

ও পাঠ-প্রণালী এলোমেলো ভাবের ছিল না। তাঁহার মন বৈজ্ঞানিক (scientific) ছাঁচে গঠিত ছিল। সেই জন্য কোন গবেষণা করিতে হইলে, তাহার কোন অংশই আন্দাজি ভাবে বা পরের মতের উপর নির্ভর করিয়া করিতেন না। নিজের মনে পর্য্যায়ক্রমে গড়িয়া তুলিতেন। কৃষ্ণনগরে শিক্ষকতা করিবার সময়ই হউক, কি বিলাতে পরীক্ষা দিতে গিয়াই হউক, কি শিবপুরে লাঙ্গল চাষেই হউক, কি শেষ জীবনের ধর্ম্মগ্রন্থ অনুশীলনেই হউক তিনি চিরকাল সেই শিষ্যের অবিচলিত ভাব ও জ্ঞানানুশীলনে সত্যনিষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের ভিত্তি এই উৎসাহপূর্ণ জ্ঞানানুশীলন। কি করিয়া তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে ঋগ্বেদসহিংতার অধ্যয়ন ও চর্চ্চাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহা সংক্ষেপে লিখিব।

মহাপুরুষগণের মধ্যে তথাগত বুদ্ধের প্রতি তাঁহার প্রাণের একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এই আকর্ষণের কারণ অনুসন্ধান করিলে বুদ্ধচরিত্রের বিশেষ ভাব—যাহা তাঁহাকে বৈরাগ্য ও মহান ত্যাগের পথে আনিয়াছিল—তাহার প্রতি অম্বিকাচরণের প্রকৃতির একটি স্বাভাবিক অনুরাগ দেখা যায়। ফলতঃ তাঁহার প্রকৃতিও বুদ্ধের বৈরাগ্য, ত্যাগ ও নিষ্ঠার অনুকূলমুখী ছিল। ইহাই তথাগত বুদ্ধের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিকী ভক্তির কারণ। এবং অবশেষে ইহা তাঁহাকে বৌদ্ধ শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত করিল।

অম্বিকাচরণ পণ্ডিত, অতএব পাণ্ডিত্যের সহিত শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু পাণ্ডিত্য প্রদর্শন উদ্দেশ্যে নয়। প্রদর্শনের

ভাবই তাঁহার মধ্যে ছিল না। বেশী কথা, বৃথাকথা বলিবার অভ্যাস তাঁহার একেবারেই ছিল না। চিরকাল মস্তক নত করিয়া চলিতে ভালবাসিতেন। এই নম্রভাব তাঁহার ধর্ম্মজীবনকে, তাঁহার শাস্ত্রালোচনাকে সুমিষ্ট ও সার্থক করিয়াছে।

বুদ্ধজীবনের বিশেষত্ব ভাব অপেক্ষা চিন্তার, ভাষা অপেক্ষা কার্য্যের প্রতি অধিক দৃষ্টিতে। উহাতে ভাব ও ভাষা লইয়া তৃপ্তি নাই। চিন্তার গভীরতায় ডুবিয়া একেবারে বাহ্য জ্ঞানের বিলোপ হইয়াছে। কল্পনার রাজ্যকে অতিক্রম করিয়া একেবারে কর্ম্মানুষ্ঠানের আরম্ভ হইয়াছে।

এমন সত্য সাধকের কি নিরীশ্বর হওয়া সম্ভব? এই চিন্তা অম্বিকাচরণের মনে প্রবল হইয়াছিল। এই চিন্তা তাঁহাকে বুদ্ধজীবনের নির্ব্বাণতত্ত্বের আলোচনায় গভীরভাবে নিয়োজিত করিয়াছিল।

নির্ব্বাণ।

জগতের নরনারী দিবা নিশি কত প্রকারের দুঃখ, সন্তাপ ভোগ করিতেছে, কিরূপে জগতের এই দুঃখ সন্তাপের অবসান হয়, কপিলাবস্তুর রাজকুমার তাহার রহস্য উদ্‌ঘাটনে সুখৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া কঠোর বৈরাগ্য ও সাধন গ্রহণ করেন। সেই সাধনের ফলই নির্ব্বাণের সুসমাচার। নরনারীকে এই সুসমাচার দান করিতে বুদ্ধ কতই না যত্ন করিয়াছিলেন। বুদ্ধের নির্ব্বাণতত্ত্বের আলোচনা অম্বিকাচরণের মনেও জগতের দুঃখবোধ তীব্ররূপে জন্মাইয়া দিয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৈদিক আলোচনা।

নির্ব্বাণতত্ত্বের আলোচনার জন্য তিনি প্রথমে দেশীয় ও বিদেশীয় অনেক পুস্তক অধ্যয়ন করেন। তাহাতে তাঁহার জ্ঞানের চরিতার্থতা হয় নাই। অবশেষে মূল পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ ও আলোচনার জন্য পালিভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। উক্ত ভাষায় অভিজ্ঞ বৌদ্ধ পণ্ডিত ও ভিক্ষু ধর্ম্মানন্দ কোশাম্বী মহোদয়কে শিক্ষক মনোনীত করেন। পরিণত বয়সে ছাত্রের মত ভাষা শিক্ষা করা বড় সামান্য ব্যপার নয়। যাহা হউক পালিভাষা শিখিয়া অবশেষে গভীরভাবে বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চ্চা ও নির্ব্বাণের গূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়াই বুদ্ধের সমসাময়িক ও পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের ধর্ম্মের গতি ও অবস্থা অনুসন্ধান করা আবশ্যক বোধ করিলেন। এই জন্য উপনিষদ ও অন্যান্য প্রাচীন দার্শনিক গ্রন্থাদি পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিত Kant, Hegel, Spinoza, Lotz প্রভৃতির অনেক গ্রন্থ যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তারপর ঋগ্বেদ সংহিতা ও Zend ভাষায় আভেস্তা নামক পুস্তক তিনি যত্ন সহকারে পাঠ করিলেন। এ বিষয়ে পার্শি পণ্ডিত মিষ্টার মডির (Mr Modi) সহিত তাঁহার পত্রে আলোচনা হইয়াছিল।

বৈদিক সংস্কৃত দুর্ব্বোধ, এজন্য কিছুদিন একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সঙ্গে একত্র পাঠ করেন। সমস্ত দিন রাজকার্য্যে ব্যাপৃত

থাকিয়াও গৃহে অবসর সময় তাঁহার প্রিয় ঋগ্বেদ্ লইয়া তিনি পাঠে বসিতেন। যাঁহারা তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়াছিলেন তাঁহারা রহস্য করিয়া বলিতেন—"আপনিই পণ্ডিতের নিকট কি পণ্ডিতই আপনার নিকট পাঠ করেন?" শাস্ত্রের ভিতরে নিমজ্জিত থাকিতে তিনি এত ভাল বাসিতেন যে, অনেক সময় পরিবার ও বন্ধুগণের নিষেধ রক্ষা করিতে পারিতেন না।

অনেকের ধারণা বুদ্ধ নিরীশ্বরবাদী ছিলেন। মূল পালিগ্রন্থ পাঠে যে দিন তিনি এই মত যে ভ্রান্ত তাহার প্রমাণ পাইলেন এবং বুদ্ধকে আত্মতত্বজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া জানিলেন, সে দিন তাঁহার এত আনন্দ হইয়াছিল যে তখনই স্ত্রী ও কন্যাকে ডাকাইয়া অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের সহিত এ কথা শুনাইয়াছিলেন। এই বিষয়টি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এজন্য পরিবার ও বন্ধুগণকে বার বার শুনাইয়া সুখী হইতেন।

যাঁহার নিকট শাস্ত্রালোচনা ও জ্ঞানানুরাগের সায় পাইতেন, তাঁহার নিকট তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ ঢালিয়া দিতেন। প্রাণ মুক্ত করিয়া দিয়া তাঁহাকে উৎসাহ দিতেন। বাঁকুড়ায় শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট তিনি আন্তরিক সায় পাইয়াছিলেন। এজন্য ধর্ম্ম ও শাস্ত্রালোচনার সূত্রে উভয়ের মধ্যে গভীর যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। মহেশবাবু লিখিয়াছেন—"তাঁহার নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ, তিনি আমার বিশেষ উপকার করিয়াছেন। আমি যে বেদ ও বৌদ্ধশাস্ত্র আলোচনা করিতে পারিতেছি, ইহা তাঁহারই জন্য। তিনি দয়া করিয়া আমাকে এ সব বিষয়ে বিশেষ

উৎসাহ দিয়াছিলেন। সেই জন্যই এ সমুদয় আলোচনা করিতে আমার আগ্রহ হইয়াছিল এবং এখনও আছে। তিনি যতদিন বাঁকুড়া সহরের উপর ছিলেন প্রায় প্রত্যহই তাঁহার সহিত বেদ ও বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা হইত। তিনি ছিলেন জজ আর আমি ছিলাম একজন স্কুলের শিক্ষক। কিন্তু তিনিই অধিকাংশ দিবস আমার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। প্রায়ই অপরাহ্ন ৫টা হইতে রাত্রি ৯॥ টা পর্য্যন্ত আলোচনা হইত। সেই যে দিন গিয়াছে তাহা আর আসিল না। তাঁহার বাড়ীতে সাহেবরা tennis খেলিতে আসিতেন, তাঁহারা যথাস্থানে খেলিতেন কিন্তু সেনমহাশয় সেই সময় আমার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। ধর্ম্ম ও দর্শনাদি বিষয়ে তাঁহার যে প্রকার আগ্রহ ছিল, সে প্রকার আগ্রহ আর দেখি না। তিনি পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অভাব আমি বিশেষ অনুভব করিয়া থাকি।"

ময়মনসিংহ অবস্থান কালে, একবার ঢাকার পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ১২ই মাঘ, বুদ্ধের নির্ব্বাণ সম্বন্ধে তিনি একটি সারগর্ভ সরস বক্তৃতা দিয়াছিলেন। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা বিশেষ শিক্ষা ও উপকার লাভ করিয়া থাকিবেন। বিষয়ের নাম শুনিয়া মনে হইতে পারে নীরস তর্ক, যুক্তি ও শাস্ত্রের জটিল তত্ত্বালোচনাই বুঝি বক্তৃতার উদ্দেশ্য ছিল। অম্বিকাচরণ যদিও শাস্ত্রে পণ্ডিত, তর্ক, যুক্তি, বিচারে পারদর্শী ছিলেন কিন্তু ভক্তির রসধারা তাঁহার পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞানে

এমন সরসতা সঞ্চার করিয়াছিল যে বুদ্ধের নির্ব্বাণতত্ত্বের ব্যাখ্যায়ও উৎসবের ভক্তিভাবের বৃদ্ধিই হইয়াছিল। শ্রোতৃগণ বক্তৃতা শুনিয়া ভক্তিতে বিগলিত হইয়াছিলেন। মানবাত্মার নির্ব্বাণ অর্থাৎ বিনাশ নয়, কিন্তু দুর্জ্জয় সুখস্পৃহার নির্ব্বাণ, বাসনা কামনা, স্বার্থপরতা, পরপীড়ন পরহিংসার বীজ সমূলে বিনাশ করিয়া জগতের প্রতি কল্যাণ-দৃষ্টিকে প্রসারিত করাই বুদ্ধের সাধন ও নির্ব্বাণতত্ত্বের গূঢ়ভাব, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। মানুষ মানুষকে ভালবাসিবে ইহা অপেক্ষা মানুষ সমস্ত জীবের প্রতি তাহার প্রেম দৃষ্টিকে প্রসারিত করিবে, জগতের কাহারও প্রতি তাহার বিদ্বেষবুদ্ধি থাকিবে না, সকলের সুখে আপনাকে সুখী জ্ঞান করিবে, বুদ্ধ-প্রচারিত এই নীতি কত উন্নত তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

তাঁহার কর্ম্মে, চরিত্রে, সর্ব্বদাই বুদ্ধ চরিত্রানুরাগের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সুজাতা পায়সান্ন আহার করাইয়া সিদ্ধার্থের মৃতপ্রাণে জীবন দান করিয়াছিলেন, এই প্রিয়স্মৃতি উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা দৌহিত্রীর সুজাতা নামকরণ করিয়াছিলেন।

অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি যখন কলিকাতা অবস্থান ও বিশেষভাবে শাস্ত্রালোচনায় মনোনিবেশ করেন, তখন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সভার সভাপতি মনোনীত হন। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাদি দ্বারা তিনি ঐ সভার সভ্যগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। তখন বৌদ্ধ সাহিত্যসমিতির সঙ্গেও তাঁহার গভীর যোগ ছিল।

বেদ সম্বন্ধে মডার্ণ রিভিউ, ইণ্ডিয়ান রিছার্চ রিভিউ, এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নেলে এবং বৌদ্ধ দর্শন ও বুদ্ধের নির্ব্বাণ সম্বন্ধে ঢাকার ইষ্ট পত্রিকায় তাঁহার অনেকগুলি প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার সমগ্র চিন্তা ও শাস্ত্রালোচনার ফল গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার আকাঙ্ক্ষা শেষ দিন পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন,—কিন্তু তাহা করিয়া যাইতে পারেন নাই। Idea of god in Rigveda এবং Hero gods of the Rigveda নামে দুইখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তদ্দারাই সুধীগণ তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাঁহার সমগ্র চিন্তা গ্রন্থবদ্ধ হইয়া মুদ্রিত হইলে, তদ্দারা দেশের উপকার হইত সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মের সারতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া, কলিকাতার ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে এবং আরও স্থানে স্থানে যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ে মহিলাদের নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকবার যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার চিন্তার মৌলিকতা, পাণ্ডিত্য, এবং গভীর ধর্ম্মবিশ্বাসের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্ম এবং বেদ সম্বন্ধে তিনি কি বলিতে চাহিয়াছিলেন, হাজারিবাগ প্রবাসী শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণে এবং স্বর্গীয় অম্বিকাচরণের প্রদত্ত নির্ব্বাণ ও প্রাচীন ভারতে ঈশ্বরান্বেষণ সম্বন্ধীয় বক্তৃতায়, পাঠকগণ তাহা বিশেষভাবে দেখিতে পাইবেন। উহা অন্যত্র মুদ্রিত হইল।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সাক্ষাৎ যোগই এই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে আরাধনা, প্রার্থনা, সৎপ্রসঙ্গ নিত্য প্রয়োজন। অম্বিকাচরণ যৌবনের প্রথম উদ্যমে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অবধি, আধ্যাত্মিক ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনে নিত্য যত্নশীল ছিলেন। কলিকাতা অবস্থান কালে অনেক সময় ভবানিপুর সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজে তাঁহাকে উপাসনা করিতে হইত। আরাধনা ও প্রার্থনায় তিনি কিরূপ সাধনপরায়ণ ছিলেন, ঐ উপাসনায় উপাসকগণ তাহার পরিচয় পাইয়া থাকিবেন। আরাধনার সময় তিনি একেবারে ডুবিয়া যাইতেন। যেমন ছাত্রজীবনে উপাসনা না করিয়া পড়া আরম্ভ করিতেন না, কর্ম্মক্ষেত্রেও তাঁহার এমনই নিষ্ঠা ছিল। এই নিষ্ঠাদ্বারা তাঁহার ধর্ম্ম সহজ ও স্বাভাবিক হইয়াছিল। কেবল উপাসনা-ক্ষেত্রে নয়—আহারে, বিহারে, কর্ম্মক্ষেত্রে বিচারালয়ে ধর্ম্ম পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

যন্ত্রের তারগুলি যথানিয়মে সংবদ্ধ হইয়া যেমন মধুর স্বর উৎপাদন করে, তেমনি নিত্য উপাসনা, ইন্দ্রিয় দমন, পর উপকার, বৈরাগ্য সাধন জীবনের ব্রত হওয়ায় অম্বিকাচরণ সমঞ্জসীভূত ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছিলেন। এক দিকে তিনি কর্ম্মী, গৃহী, পরিবারবদ্ধ সাংসারিক ব্যক্তি ছিলেন, সংসারের সমস্ত ব্যবস্থা তাঁহাকে দেখিতে হইত, অপর দিকে সাধক, জ্ঞানী, ভক্ত লোক ছিলেন। যাহারা সংসার করে তাহারা ধর্ম্মে উদাসীন, যাহারা

ধর্ম্মানুশীলন করে তাহারা সংসার কার্য্যে অনভিজ্ঞ, এমন সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অম্বিকাচরণের জ্ঞান সব দিকে উজ্জ্বল ছিল। উচ্চ রাজকার্য্যে নিয়োজিত থাকিয়াও তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। কারণ কার্য্যের ক্ষুদ্র বৃহতের বিচার তিনি করিতেন না। কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যেরই বিচার করিতেন। তজ্জন্য দেখিতে পাই, গৃহের নবপ্রসূতা গাভীর জন্য কিরূপ খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে, গৃহ নির্ম্মাণে কোন্ স্থানে কোন্ নম্বরের ইট সুরকি বা কিরূপ মাল মসলা দিতে হইবে, দূর হইতে তাহারও পরামর্শ নিজে দিতেন।

যে সাধক অনন্যমনে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন, তাঁহাকে ধর্ম্ম-জীবনের নেতা ও চালক করেন, তাঁহার ধর্ম্ম, অনুষ্ঠানে আবদ্ধ থাকে না। উহা তাঁহার জীবনে ব্যাপ্ত হয়। ঈশ্বর কৃপা করিয়া এমন সাধকের সাধনের সাধ পূর্ণ করেন, তাঁহার নিকট আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। ইহাতে যাহা পূর্ব্বে অর্থহীন ছিল তাহা অর্থযুক্ত হয়। যাহা সৌন্দর্য্য ও প্রাণহীন জড়মাত্র প্রতীয়মান হইত, তাহা শোভা সৌন্দর্য্যের আধার প্রাণময় ব্রহ্মসত্তায় পূর্ণ দেখিতে পান। অম্বিকাচরণের এই অবস্থা লাভ হইয়াছিল। ইহার সাক্ষীরূপে তাঁহার নিজের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"উড়িষ্যার খণ্ড গিরিতে বৌদ্ধ যুগের অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি আছে। এক সময় আমি এবং আমার একজন বন্ধু সেই স্থানে গিয়াছিলাম। আমরা একখণ্ড শিলার উপর বসিয়া উপাসনা আরম্ভ করিব, এমন সময় অনুভব করিলাম, সমস্ত বায়ু মহা

ঘনীভূত ব্রহ্মসত্তায় পূর্ণ। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছিলেন, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম তাবৎ ব্রহ্মসত্তায় পরিপূর্ণ। সৃষ্টির যাহা কিছু নিত্যরূপে সেই ব্রহ্মেতে স্থিতি করিতেছে। ইহার কিছুই অনিত্য নহে। রামানুজ যথার্থই বলিয়াছেন—সেই সত্য স্বরূপ, সত্যসংকল্প ঈশ্বর কি প্রকারে মিথ্যা রচনা করিবেন। তাঁহার হস্তের রচনাই সত্য এবং সুন্দর। ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ, নিম্নে বসুন্ধরা সমস্তই সেই মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বের পরিচয় দিতেছে। ইহাতেও বোধ হয় সেই প্রেমময়ের প্রেমের পরিসমাপ্তি হইল না। তিনি মনুষ্য হৃদয়ে তাঁহার প্রেমের একবিন্দু দান করিয়া, তাঁহার সঙ্গে যে মধুর সম্পর্ক, তাহা ব্যক্ত করিলেন। তিনি স্বয়ং বলিয়া দিলেন "সন্তানগণ, তোমরা আমাকে পিতা, মাতা, বন্ধু বলিয়া ডাক, ইহাই পূর্ণ ধর্ম্ম।" *

জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মের অধিকারে রক্ষা করার শিক্ষা অর্থাৎ প্রতি কার্য্যে প্রতি ঘটনায় ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিয়া চলিবার শিক্ষা, মহাত্মা খৃষ্ট এবং আচার্য্য কেশবচন্দ্রের জীবন হইতে তিনি লাভ করিয়াছিলেন।

খৃষ্ট ও ব্রাহ্মসমাজ।

১৯০৮ সনের ১০ই পৌষ খৃষ্টোৎসব উপলক্ষে ভারতবর্ষীয়

* ১৮৩০ শক ১০ই পৌষ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে খৃষ্ট ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রদত্ত বক্তৃতা।

ব্রহ্মমন্দিরে খৃষ্ট ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে তিনি একটী বক্তৃতা করেন। উহাতে অম্বিকাচরণের ধর্ম্ম বিশ্বাস কি ছিল তাহা বেশ প্রতীয়মান হয়। ঐ বক্তৃতায় আচার্য্যের জীবনের বিশেষত্ব, আচার্য্যের প্রতি তাঁহার ভাব, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব, হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভেদ, খৃষ্টধর্ম্মের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্বন্ধ প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্রে সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"জীবন বেদের প্রথম অধ্যায়ে প্রার্থনা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ নূতন, তাহা ইতিপূর্ব্বে আর কোন হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রকাশিত হয় নাই। প্রার্থনা করিলেই শোনা যায়, কি ধর্ম্ম লইব প্রার্থনা তাহার উত্তর দেয়, আফিসের কাজ ছাড়িব কি ধর্ম্ম প্রচারক হইব প্রার্থনাই তাহা বলিয়া দেয়, স্ত্রীর সহিত কিরূপ সম্পর্ক রাখিব প্রার্থনাই তাহার নির্দ্ধারণ করে। এই যে মানুষের সহিত দেবতার কথোপকথন, ঈশ্বরের বাণী শুনিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা, ইহা এদেশে সম্পূর্ণ নূতন ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম কখনও ভারতে আসে নাই। ইতিপূর্ব্বে ভারতে যে ধর্ম্মভাব আসিয়াছিল তাহা যোগের ধর্ম্ম, প্রেমের ধর্ম্ম। কিন্তু এই যে ঈশ্বরকে গুরু জানিয়া তাঁহার আদিষ্ট পথে চলা, বন্ধু জানিয়া তাঁহাকে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করা এপথ পূর্ব্ব বিধান হইতে ভিন্নতর। এই আদেশ পালন করিবার জন্য তাঁহাকে কুচবিহার বিবাহের সময় মহা অগ্নি-পরীক্ষায় নিপতিত হইতে হইয়াছিল। অজানিত স্থানে, এক বৃহৎ রাজ অট্টালিকার মধ্যে এক দিকে বিবাহের মহোৎসব, আর একদিকে

আচার্য্য দেব সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া দুর্ব্বিসহ যাতনা অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু এই নির্য্যাতনের ফল স্বরূপ, নববিধানরূপ মহাসমন্বয়ের ধর্ম্ম লাভ করিলেন। পূর্ব্বে ধর্ম্মে ধর্ম্মে, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকে মতভেদ ছিল, ঈশা একপথে, মহম্মদ এক পথে, গৌরাঙ্গ একপথে গিয়াছিলেন। এক্ষণে সব পথ এক পথ হইল। সব ধর্ম্ম এক মহা বিশ্বজনীন ধর্ম্মে পরিণত হইল।”

প্রার্থনা।

মহর্ষির ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মানন্দ রস-পান আত্মার আনন্দ ও শান্তির স্থল। কিন্তু কর্ম্মীর কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি কার্য্যে বল, উৎসাহ, পরামর্শ এবং শ্রেয়োবুদ্ধিদাতা রূপে একজন নিত্য সঙ্গী জাগ্রত জীবন্ত ঈশ্বরেরও অবশ্য প্রয়োজন। সারে ধর্ম্ম সাধনের ব্রত লইয়া ব্রাহ্মগণ এমন সঙ্গীর বিশেষ আবশ্যকতা যখন অনুভব করিলেন তখন শুভক্ষণে আচার্য্য কেশব ব্রাহ্ম-সমাজে প্রার্থনাশীলতার বার্ত্তা প্রচার করিলেন, খৃষ্টের পিতা ঈশ্বর প্রার্থনার উত্তরদাতা হইয়া তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন। তদবধি ব্রাহ্মগণের সম্মুখেও এক শ্রেয়োজনক পথ খুলিয়া গেল। প্রার্থনার সাহায্যে অনেকের ধর্ম্মজীবন সহজ হইয়া উঠিল।

অম্বিকাচরণ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রার্থনাশীলতা দ্বারা বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছিলেন। উহা তাঁহার দৈনিক জীবনকে সঞ্জীবিত ও পরিপুষ্ট করিয়াছিল। সংসারকে কারাগাররূপে নয়, কিন্তু

সরস ধর্ম্মক্ষেত্ররূপে দেখিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। প্রার্থনার সাহায্যে প্রতি কর্ম্মে তাঁহার ধর্ম্মসাধন চলিত।

কোন খাদ্য গ্রহণের সময় যেমন বিধাতার প্রতি, তেমনি রন্ধনকারীর প্রতিও তাঁহার কৃতজ্ঞতার অবধি থাকিত না। যে কোন খাদ্য, এমন কি সামান্য একটি ফল ভক্ষণেও দাতাকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ দিতেন। ফলের সুমিষ্ট রস তাঁহাকে ভগবানের করুণার রস-ধারায় অভিষিক্ত করিত।

তাঁহার জীবন প্রার্থনাময় ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাড়ী হইতে রওয়ানা হইয়া গাড়ীতে উঠিয়াই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া প্রার্থনা করিতেন। যে কোন কার্য্য আরম্ভের অগ্রে প্রার্থনা। বিচারালয়ে উপবেশন কি বাড়ী করা, বন্ধুদের খাওয়ান কি ক্ষুদ্র একটি বৃক্ষ রোপণ, সকল কাজেই প্রার্থনা নিত্য সঙ্গী ছিল। সকল কাজেই গাম্ভীর্য্য ও কৃতজ্ঞতা দেখাইতেন। দাতাকে ধন্যবাদ না দিয়া তিনি কিছুই লইতেন না। এমন একনিষ্ঠ সাধকের প্রতি ধর্ম্ম অবশ্যই প্রসন্ন হন। এই জন্যই তাঁহার ধর্ম্ম জীবনময় দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

উপাসনা।

পারিবারিক উপাসনার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল। এজন্য তেতালার একটি ঘর বিশেষ ভাবে উপাসনার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। এই ঘরে তিনি দৈনিক উপাসনায় বসিতেন এবং পরিবারের অন্যেরা সুবিধা মত গিয়া তাঁহার উপাসনায় যোগ

দিতেন। সকলের সব সময় সুবিধা না হইলেও তাঁহার নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না।

সামাজিক উপাসনার প্রতি চিরদিন তাঁহার গভী নিষ্ঠা ছিল। নিতান্ত অসমর্থ না হইলে তিনি কখনও মন্দিরে উপাসনায় অনুপস্থিত হইতেন না। অল্প শিক্ষিত অতি স এক এক জন আচার্য্যের উপাসনায় এমন নিষ্ঠার সহিত যোগ দিতেন, তাঁহাদের কথাবার্ত্তা ও উপদেশে এমন উপকার হইল মনে করিতেন যে, দেখিলে তাঁহার বিনয় ও দীনতার অবশ্যই প্রশংসা করিতে হইত। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সেন মহাশয় লিখিয়াছেন ;— ময়মনসিংহে ডিষ্ট্রিক্ট জজ থাকা কালীন, অনেক রবিবার, প্রচারক ভাই দীননাথ কর্ম্মকার এবং ভাই চন্দ্রমোহন কর্ম্মকারের সহিত উপাসনায় ও সপাক ভোজনে যোগ দিতে যাইতেন। উঠানে সামান্য মাদুরে বসিয়া ভাইদের সঙ্গে ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিতে থাকিতেন। ওদিকে প্রচারক ভাইরা রান্না করিতে থাকিতেন। ইঁহাদের একজন নর্ম্মাল স্কুলে পাশ, অন্য জনের শিক্ষা তদপেক্ষাও সামান্য। আর তিনি সহরের দায়রার জজ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। কিন্তু তাঁহার এমনই ধর্ম্মানুরাগ, বিনয় ও ভক্তি ছিল যে, পদমর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।”

উৎসবাদি ব্যাপারে তাঁহার এমন আকর্ষণ ছিল যে, ক্লেশ হইলেও যাইতেন। ময়মনসিংহে অবস্থান কালে, অনেক সময়, উৎসবে ঢাকার বন্ধুদের সঙ্গে আসিয়া মিলিতেন। যেন কয়েক দিন

তাঁহাদের সঙ্গে একত্র উপাসনা ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিয়া বল সঞ্চয় করিয়া লইতেন।

যখন কর্ম্মক্ষেত্রে মফস্বল থাকিতেন ধর্ম্মবন্ধুদের নিকট আসিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ছটফট করিত। উৎসবের সময় শত ক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেন। একবার ১১ই মাঘের উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য, মফস্বল হইতে কটকে আসিতেছিলেন। মহানদী পার হওয়ার সময় স্রোতোবেগে তাঁহার নৌকা বাঁধে ঠেকিয়া মারা যাইতেছিল। চাপরাশীদের প্রাণপণ চেষ্টায় কোন ক্রমে রক্ষা পাইয়াছিলেন। উৎসবে উপস্থিত হওয়ার এমন আগ্রহের উল্লেখ করিয়া, তথাকার উচ্চপদস্থ কোন রাজকর্ম্মচারীর পত্নী (ইনিও ব্রাহ্ম) বলিয়াছিলেন উনি দূরহইতে এত কষ্ট করিয়া উৎসবে আসিলেন আর আমরা কি এখানে থাকিয়াও মন্দিরে যাব না।”

ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মে।

তিনি কর্ম্মসূত্রে যখন যেখানে যাইতেন, আপনাকে ব্রাহ্ম-সমাজের কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেন। ধর্ম্মালোচনা ও সৎ প্রসঙ্গ করিয়া মণ্ডলীর সেবা করিতেন। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র, অমায়িক ব্যবহার, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, বিশ্বাস, ভক্তি, বিনয় লোকের আকর্ষণের বিষয় ছিল। ময়মনসিংহ অবস্থান কালে তথায় ব্রহ্ম-বিদ্যা শিক্ষার জন্য, রবিবার অপরাহ্নে নিয়মিত রূপে কয়েক মাস বক্তৃতা ও আলোচনা করিয়াছিলেন। ঐ সকল বক্তৃতা ও

আলোচনায় ধর্ম্ম বিজ্ঞানে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্ম জীবনের উচ্চ অবস্থার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বিনয় ও মিষ্ট প্রকৃতি, শাস্ত্র জ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মবিশ্বাস ও ভক্তি মিলিত হইলে ধর্ম্মোপদেশ কিরূপ সরস ও শিক্ষণীয় হয়, শ্রোতৃগণ তাহা অনুভব করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের সেবায় এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে তাঁহার একান্ত আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল। এজন্য কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, আপনাকে ব্রাহ্মসমাজের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনার কার্য্য অনেক সময় তিনি করিতেন। যদিও তাঁহার শরীর যথোচিত সুস্থ ছিল না, তবু এই কার্য্যে আপত্তি করিতেন না। তাঁহার শারীরিক অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া, এইরূপ কার্য্যভার গ্রহণে যদিও পত্নীর উৎসাহ ছিল না, উপাসনা, বক্তৃতান্তে তাঁহাকে অধিকতর অবসন্ন দেখিয়া বরং তাঁহার নিতান্ত উদ্বেগ প্রকাশ পাইত, তবু ত অম্বিকা-চরণ নিরস্ত হইতেন না। যতদিন শরীর আছে প্রভুর কর্ম্মেই ব্যবহৃত হউক, ইহাই তাঁহার ভাব ছিল।

তাঁহার জন্মক্ষেত্র মানিকগঞ্জে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হয়, এমন ইচ্ছা বিশেষ ভাবে পোষণ করিতেন। এজন্য পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্ম সম্মিলনীর হস্তে প্রচারকের বৃত্তি বাবদ অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে, ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনে দেহমন নিয়োজিত করিয়াছেন, তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও সুবিধার জন্য অর্থ ব্যয়কে তিনি সার্থক জ্ঞান করিতেন।

দলাদলি।

দলাদলি কোন প্রকারেই তাঁহার মধ্যে ছিল না, সুতরাং সাধারণ কি নববিধানের বিচার না করিয়া সকল সমাজের কর্ম্মীদের সাহায্যেই নিযুক্ত হইতেন, প্রচার কার্য্যে উভয় পক্ষকেই সাহায্য করিতেন।

নববিধান সমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই উভয় সমাজের সঙ্গে তিনি শেষ পর্য্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিয়াছিলেন। দুই সমাজেই তাঁহার শ্রদ্ধার, ভালবাসার, ও স্নেহের পাত্র যথেষ্ট ছিল বলিয়াই সকলকে আপনার করিতে পারিয়াছিলেন; এবং দুই সমাজই "তিনি আমাদের" এই বলিয়া তাঁহাকে আদর করিতেন।

যদিও এই দুই সমাজের কোনটিরই মেম্বর হন নাই, তিনি ভবানীপুর সম্মিলন সমাজের মেম্বর ও Governing Bodyর মেম্বর হইয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম মিলনের ধর্ম্ম ছিল। তিনি বলিতেন যে তিনি আচার্য্য কেশবচন্দ্রের কাছে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মেম্বর ছিলেন। অতএব পরের দলাদলির ভিতর কোন দলেই যোগ দেন নাই।

বুদ্ধদেবের প্রতি একান্ত পক্ষপাতী হইয়াও তিনি ঈশা কিংবা অন্য মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে, ত্রুটি করেন নাই। আর বুদ্ধদেবের সম্বন্ধেও একথা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই যে "বুদ্ধ ঈশ্বরের নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ না করায় এই হইয়াছে যে তাঁহার শিষ্যগণ অবশেষে তাঁহাকেই ঈশ্বরের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার পূজা করিয়াছেন।"

শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

"তিনি সুবোধ বালক, পবিত্র চরিত্র যুবক, শান্তদান্ত বিবেক যুক্ত প্রৌঢ়রূপে প্রাকৃতিক জীবন যাপন করিয়াছেন। তাঁহার কথাবার্ত্তা, তাঁহার গতিবিধি তাঁহার রীতি নীতি সকলই তাঁহার চরিত্রের অনুরূপ ছিল, উহা তাঁহার প্রকৃতিগত গাম্ভীর্য্যের পরিচায়ক ছিল। তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল ছিল, পাপের জন্য তাঁহাকে কখনও অনুতাপ করিতে হয় নাই। বিদ্যাভিমান কি ধর্ম্মাভিমান কি সাধনের অভিমান তাঁহার জীবনে কখনও দেখা যায় নাই।

তাঁহাতে কখনও কোনরূপ অমিতাচার প্রকাশ পায় নাই। সর্ব্বদা সকল ক্ষেত্রে ধর্ম্মজীবন যাপন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ভস্মাবশেষ রাখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। জগত হইতে তাঁহার নাম মুছিয়া যাউক এমন ইচ্ছা করিয়া তিনি বুদ্ধ চরিত্রানুরাগেরই যথার্থ পরিচয় দিয়াছিলেন। বলিতেন আত্মা নামহীন, উপাধিহীন, অজর, অমর, অক্ষয়। দেহের বিনাশে তাহার বিনাশ সম্ভব না। আর দেহের স্মৃতিদ্বারাও তাহার যথার্থ সাফল্য সম্ভব ন"



শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৈদিক আলোচনা।

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ বি, এ, লিখিত।

বুদ্ধের প্রতি সেনমহাশয়ের প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় আমি পাইয়াছিলাম। বুদ্ধকে তিনি জগতের মধ্যে একজন অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতেন। বুদ্ধের উপদেশাদি পাঠ করিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। এজন্য উপাসনা কালে প্রায়ই বুদ্ধের কথার উল্লেখ করিতেন। অন্য বিষয়ের উপদেশ সময়েও বুদ্ধের উপদেশের উল্লেখ করিয়া পরিসমাপ্ত করিতেন। ব্রাহ্মসমাজ বুদ্ধকে তেমন ভাবে গ্রহণ করেন নাই বলিয়া তাঁহাকে প্রায়ই দুঃখ করিতে শুনিতাম। এই প্রকার অনুরাগ জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম আলোচনাকে তিনি তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ম্মরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেদাদি অন্যান্য শাস্ত্রের আলোচনা ইহার আনুসঙ্গিক ছিল।

বুদ্ধকে নিরীশ্বরবাদী মনে করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হওয়ায় তিনি বুদ্ধের বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। বৌদ্ধশাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ করেন। বৌদ্ধশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া তাঁহার সম্যক হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল বুদ্ধ নিরীশ্বরবাদী নহেন।

বৌদ্ধ শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি প্রথমেই নির্ব্বাণতত্ত্বে মনোনিবেশ করেন। এই তত্ত্বালোচনা করিয়া তিনি প্রমাণ করিয়াছেন "নির্ব্বাণ অর্থ মুক্তি, ইহা দ্বারা দেহ পবিত্র হয়; মন বাসনা, হিংসা, বিদ্বেষকে অতিক্রম করে। ইহাই অমৃতত্ব, সুখ-

সাগর, এবং শান্তিপদ। নির্ব্বাণ লাভ করিলে হৃদয়ের অন্ধকার বিদূরিত হয়, সত্য প্রকাশিত হয়, এবং মানব দিব্যালোকে আলোকিত হয়।" তিনি বলিয়াছেন "নির্ব্বাণদ্বারা প্রাচীন জীবনের বিনাশ এবং নূতন জীবনের আরম্ভ হয়। এই নির্ব্বাণে গৌতম সিদ্ধার্থ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বুদ্ধজীবনের আরম্ভ হইয়াছিল। তখন তিনি তথাগত অর্থাৎ তত্রাগত অর্থাৎ সংসার-সাগর পার হইয়া অপর পারে উপনীত হইয়াছেন। তখন আর তিনি প্রাচীন নামে পরিচিত হইতে পারেন না। এই নির্ব্বাণই পুনর্জ্জন্ম এবং দ্বিজত্ব লাভ।"

"Nirvan is deliverence. It chastens the body and frees the mind from desire, excitement, passion and wrong doing. It is immortality, the lake of Ambrosia and the glad city of peace. On the attainment of Nirvan the heart beccomes the abode of the deepest truth, darkness vanish away and the mind becomes perfectly enli[illegible]tened. Nirvan is the extinction of self. On his entering Nirvan the life of Goutama Siddhartha was extinguished. He bocame altogether a differnt person—the Buddha (Perfectly awakened) the Bhagavat (the Blessed one) the Tathagata (Tatragata—one who has reached the other shore). It would be a mistake to call him now by his old name. Even his relations with brother men

have changed. He has become an Acharya. (Teacher). Nirvan is a rebirth—a higher birth. He has become a dwija."

তিনি আরও বলিয়াছেন এই নির্ব্বাণ সাময়িক পরিবর্ত্তন নহে। ইহা এক অচ্যুত অবস্থা যাহা লাভ করিলে পতন অসম্ভব হইয়া পড়ে।

যিনি নির্ব্বাণ লাভ করিয়া তথাগত হইয়াছিলেন, দেহ মনে শুদ্ধতা লাভ করিয়া অচ্যুত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি কখনও নিরীশ্বর হইতে পারেন না, সেনমহাশয়ের ইহাই ধারণা জন্মিয়াছিল। * তাঁহার এ ধারণা যে ভিত্তিহীন নহে বৌদ্ধশাস্ত্রে তিনি তাহার প্রমাণ পাইয়াছিলেন, এবং ঐ সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া এই মতকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মজ্‌ঝিমনিকায় নামক বৌদ্ধ গ্রন্থের ৭২ সূত্তে নিম্নলিখিত ঘটনাটি বিবৃত আছে ;—

বচ্ছগোত্ত নামক একজন পরিব্রাজক ভগবান বুদ্ধকে এই প্রকার বলিলেন—'ভো গোতম, এই লোক অর্থাৎ জগৎ শাশ্বত এই মতই সত্য, অন্য মত মিথ্যা গোতম কি এইপ্রকার মনে করেন ?'

বুদ্ধ উত্তর করিলেন—"হে বচ্ছ, আমি ইহা মনে করি না যে এই লোক শাশ্বত, এই মতই সত্য, অন্য মত মিথ্যা।"

'ভো গোতম, এই লোক অশাশ্বত এই মতই সত্য, অন্য মত মিথ্যা, গোতম কি এইপ্রকার মনে করেন ?'

"ভো বচ্ছ, আমি ইহা মনে করি না যে এই লোক অশাশ্বত এই মতই সত্য, অন্য মত মিথ্যা।"

ইহার পর বচ্ছগোত্ত আরও অনেক প্রশ্ন …য়াছিলেন। তাহার মধ্যে কয়েকটি এই—(১) মুক্ত পুরুষ মৃত্যু… পর বর্ত্তমান থাকেন এই মতই কি সত্য? (২) মুক্ত পু… মৃত্যুর পর বর্ত্তমান থাকেন না এই মতই কি সত্য? (৩) মু… …রুষ মৃত্যুর পর বর্ত্তমান থাকেন এবং বর্ত্তমান থাকেন না … উভয়ই কি সত্য? (৪) মুক্ত পুরুষ মৃত্যুর পর বর্ত্তমান থা… …, এবং অবর্ত্তমানও থাকেন না, এই উভয়ই কি সত্য?

ভগবান বুদ্ধ প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরেই বলিলেন— …মি ইহা মনে করি না যে এই মতই সত্য এবং অন্য মত মিথ্যা। ইহার পর বচ্ছগোত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গোতম এই সমুদ… …ত কি আপত্তি দেখিয়াছেন যে তিনি এই সমুদয় গ্রহণ করেন …।'

বুদ্ধ বলিলেন, "এই সমুদয় মত গহনস্বরূপ, … …রস্বরূপ, পুত্তলিকা ক্রীড়াবৎ, বিস্পন্দন এবং বন্ধনের কারণ। ইহা দুঃখ-পূর্ণ, বিঘ্নপূর্ণ, নিরাশাপূর্ণ ও পরিতাপপূর্ণ। ইহাতে নির্বেদ, বৈরাগ্য, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞতা, সম্যকবোধ ও নির্ব্বাণের কোন সম্ভাবনা নাই। এই সমুদয় আপত্তির জন্যই আমি এই সমুদয় মত গ্রহণ করি নাই।"

বচ্ছগোত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এই বিষয়ে গোতমের কি কোন মত আছে?' বুদ্ধ বলিলেন—"তথাগত মতের অতীত।" বচ্ছ জিজ্ঞাসা করিলেন—'বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুর কি জন্ম হয়?' বুদ্ধ

বলিলেন "পুনর্ব্বার জন্ম ইহা বলা সঙ্গত হয় না।" বচ্ছ বলিলেন 'তবে হে গোতম তাহার জন্ম হয় না?' বুদ্ধ বলিলেন "তাহার জন্ম হয় না এরূপ বলাও সঙ্গত হয় না।" বচ্ছগোত্ত বলিলেন 'তবে তাহার জন্ম হয় এবং জন্ম হয়ও না?' বুদ্ধ বলিলেন "জন্ম হয় এবং জন্ম হয় না এরূপ বলাও সঙ্গত হয় না।" বচ্ছ বলিলেন 'তবে তাহার জন্ম হয় এমনও নহে, জন্ম হয় না এমন নহে?' বুদ্ধ বলিলেন "জন্ম হয় এমনও নহে, জন্ম হয় না এমনও নহে, এরূপ বলাও সঙ্গত হয় না।"

এই সমুদয় কথা শুনিয়া বচ্ছগোত্ত বলিলেন, 'আমি অজ্ঞানতায় পতিত হইলাম, মোহপ্রাপ্ত হইলাম।' বুদ্ধ বলিলেন "ইহা অজ্ঞানতা প্রাপ্তির কথা নহে। মোহপ্রাপ্তির কথা নহে। হে বচ্ছ, এই ধর্ম্ম গম্ভীর দুর্দ্দর্শ, দুর্বোধ্য, শান্ত, অত্যুৎকৃষ্ট, অতর্কণীয়, সূক্ষ্ম, এবং পণ্ডিতবেদ্য।" তাহার পর বুদ্ধ ও বচ্ছগোত্তের এইপ্রকার প্রশ্নোত্তর হইল।

বুদ্ধ—"তোমার পুরোভাগে যদি অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে তুমি কি জানিবে যে অগ্নি রহিয়াছে?" 'হাঁ জানিব।' "কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে এই অগ্নি কাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রজ্বলিত হইতেছে, তুমি কি উত্তর দিবে?" "আমি বলিব তৃণ ও কাষ্ঠকে অবলম্বন করিয়া এই অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। "এই অগ্নি যদি নির্ব্বাপিত হয় তুমি কি জানিতে পারিবে?" 'হাঁ জানিতে পারিব।' "কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে এই অগ্নি কোন্ দেশে গমন করিল? পূর্ব্বে না পশ্চিমে না উত্তরে না দক্ষিণে?" 'এ প্রশ্ন এখানে সঙ্গত হয় না।

কারণ ইহা তৃণ কাষ্ঠ অবলম্বন করিয়া জ্বলিতেছিল। ইহা নিঃশেষ হইবার পর অন্য তৃণ কাষ্ঠ সংগৃহীত না হওয়ায় আহারের অভাবে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।'

বুদ্ধ বলিলেন, "হে বচ্ছ, যেরূপ বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানদ্বারা তথাগতের অস্তিত্ব বর্ণন করা যাইতে পারে তথাগতের সেইরূপ বেদনা সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান অপনীত হইয়াছে, উচ্ছিন্নমূল হইয়াছে, অসম্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা বিদূরিত হইয়াছে। তথাগত রাগ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান হইতে বিমুক্ত এবং মহাসমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, অপ্রমেয়, দুরবগাহ্য। তিনি উৎপন্ন হন না উৎপন্ন হন না ইত্যাদি কথা বলা সঙ্গত হয় না।"

ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে নির্ব্বাণ মুক্তাত্মার আত্যন্তিক বিনাশ নহে; ইহা এক অচ্যুত পদ এবং অবস্থা। বেদান্তে ইহাকেই মোক্ষ বা ব্রহ্মাবস্থা বলা হইয়াছে।

বুদ্ধ নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না, সেনমহাশয় বহুস্থল উদ্ধৃত করিয়া ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বৌদ্ধগ্রন্থ উদানের একস্থলে আছে, বুদ্ধ বলিতেছেন—"হে ভিক্ষুগণ, এমন এক আয়তন আছে যাহাতে পৃথিবী নাই, জল নাই, তেজ নাই, বায়ু নাই, যাহাতে আকাশের অনন্ত আয়তন নাই, বিজ্ঞানের অনন্ত আয়তন নাই, অবস্তুর আয়তন নাই, সংজ্ঞা কিংবা অসংজ্ঞার আয়তন নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, চন্দ্র এবং সূর্য্য এতদুভয়ও নাই। আমি ইহাকে আগমনও বলি না, গমনও বলি না, স্থিতিও

বলি না, চ্যুতিও বলি না, এবং উপপত্তিও বলি না। ইহা প্রতিষ্ঠা-বিহীন, প্রবর্ত্তনবিহীন, নিরালম্ব এবং ইহাই দুঃখের অন্ত। হে ভিক্ষুগণ এমন কিছু আছে, যাহা অজাত, অভূত, অকৃত, এবং অযৌগিক। হে ভিক্ষুগণ যদি অজাত, অভূত, অকৃত ও অযৌগিক কোন বস্তু না থাকিত তাহা হইলে জাত, ভূত, কৃত ও যৌগিক বস্তুর মুক্তি সম্ভব হইত না। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, অজাত, অভূত, অকৃত ও অযৌগিক কোনও এক বস্তু আছে, এইজন্য জাত, ভূত, কৃত ও যৌগিক বস্তু সমূহের মুক্তি সম্ভব।"

এখানে যে অবস্থা বা বস্তুর কথা বলা হইল তাহা বেদান্তের ব্রহ্মই। সেনমহাশয় ইচ্ছা করিয়াছিলেন পরে এ সকল বিস্তৃত করিয়া লিখিবেন, কিন্তু তিনি তাহা লিখিয়া যাইতে পারেন নাই।

পুনর্জ্জন্ম মত ভারতবর্ষে যে ভাবে গ্রহণ করা হয় বুদ্ধ উহা সেভাবে গ্রহণ করিতেন না, সেনমহাশয়ের ইহাই বিশ্বাস ছিল। জনসাধারণের এ সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাস ছিল বুদ্ধ তাহার প্রতিবাদ না করিয়া সেই মতের ভিতরেই নূতন গভীরতর ভাব প্রচলিত ভাষা গ্রহণ করিয়াই প্রবেশ করাইতেন, অথবা নূতন ভাবে ব্যাখ্যা করিতেন, ইহাই সেনমহাশয় বলিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা শেষ করিবার পূর্ব্বেই তিনি অনুভব করিলেন বৌধদ্ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব এবং ধর্ম্ম-সাহিত্যে ক্রমবিকাশ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য বৈদিক আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজন। এজন্য বেদপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। সেনমহাশয়ের বেদাধ্যয়ন

অদ্ভুত ব্যাপার। সাধারণভাবে অধ্যয়ন নহে, গভীর আলোচনা ও চিন্তনের সহিত অধ্যয়ন। ঋক্‌বেদ ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য তিনি আভেস্তা শাস্ত্রও পাঠ করিলেন। এই গ্রন্থের সহিত ঋক্‌-বেদের অনেক মিল আছে।

বেদ পাঠ করা নিতান্ত সহজ নহে, কারণ বৈদিক ভাষার সঙ্গে বর্ত্তমান সংস্কৃতের অনেক প্রভেদ। বর্ত্তমানের সংস্কৃত জ্ঞান লইয়া বৈদিক সাহিত্য সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হয় না। সেনমহাশয় এ নিমিত্ত বেদের টীকাকার সায়নাচার্য্যের সহায়তা গ্রহণ করিলেন। আচার্য্য সায়ন প্রত্যেক কথার অর্থ করিয়া তৎসাহায্যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু অনেকস্থলে এমন অর্থ করিয়াছেন যাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না। এজন্য সেনমহাশয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যারও সহায়তা লইয়াছেন।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক আছেন। একদল সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যার অনুসরণ করেন, অপর দল বলেন সায়নাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণের অনেকে এবং সায়নাচার্য্য নিজেও যখন অনেকস্থলে এক, দুই বা ততোধিক অর্থ করিয়াছেন এবং অনেকস্থলের ব্যাখ্যা যখন কিছুতেই সঙ্গতার্থ বলিয়া বোধ হয় না, তখন সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যাও সকলস্থলে যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। অতএব তাঁহারা নিজেরাই অর্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এক একটি শব্দের কত স্থানে প্রয়োগ হইয়াছে তাহা সংগ্রহ করিয়া অভিধান প্রস্তুত করিয়া তৎসাহায্যে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেনমহাশয়

সায়নাচার্য্য এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যার সঙ্গে আপনার জ্ঞান ও বিচার মিলাইয়া যে সঙ্গতার্থে উপনীত হইতেন তাহাই গ্রহণ করিতেন। প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ পণ্ডিত গ্র্যাসম্যান (Grass mann) বেদ সম্বন্ধে একখানি উৎকৃষ্ট অভিধান প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু উহা জার্ম্মাণভাষায় লিখিত। সেনমহাশয় জার্ম্মাণভাষা জানিতেন না। অথচ উক্ত অভিধানের সহায়তার নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। এজন্য ক্ষুদ্র একখানি জার্ম্মাণব্যাকরণ আনাইয়া তাহার সাহায্যে ইংরেজীজার্ম্মাণ অভিধানের সঙ্গে মিলাইয়া উক্ত অভিধানের সহায়তা লাভ করিতে লাগিলেন। এইরূপ করিয়া বেদের অর্থ উদ্ধার করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। এ নিমিত্ত তাঁহাকে কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তা ছাড়া সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্যে কিরূপ অর্থ হইতে পারে তাহা বুঝিবার জন্য একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে সহকারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

প্রত্যেকটি শব্দ ধরিয়া অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিতেন। আধুনিক সংস্কৃতের সঙ্গে যে সকল শব্দের মিল আছে তাহার অর্থ করিতে তত কষ্ট হইত না, কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃতের অর্থের আবিষ্কার সহজে হইত এমন নয়। তখন দুই জনের আলোচনার সঙ্গে সায়নাচার্য্যের এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মত মিলাইয়া কি অর্থ হইতে পারে তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সহকারী পণ্ডিতকে অনেক সময়ই পরাস্ত হইতে হইত। কিন্তু তিনি কিছুতেই পরাস্ত হইতেন না। অনেক সময় দেখিয়াছি

আমরাও যে সকল স্থলের সঙ্গতার্থ কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই, তিনি তাঁহার সূক্ষ্মচিন্তার সাহায্যে তাহারও সুন্দর অর্থ করিয়াছেন। প্রকৃত কথা এই ধর্ম্মসাহিত্য আলোচনায় তাঁহার অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল।

এইরূপ আলোচনা সহকারে অধ্যয়ন বেশী অগ্রসর হইত না, হয়ত একএক দিন চারিপাঁচটি মন্ত্রের অধিক পাঠ হইত না। কিন্তু যে সকল মন্ত্র পড়া হইত তাহার প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা তাঁহার নোটবুকে লিখিয়া লইতেন। উচ্চ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়াও শাস্ত্র অধ্যয়নে এবং শাস্ত্র আলোচনায় এইরূপ নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও সূক্ষ্ম চিন্তার পরিচয় দেওয়া সহজ নয়।

হিন্দুর বিশ্বাস বেদ অপৌরষেয় এবং বেদে যে সকল দেবতার বর্ণনা আছে সে সকল দেবতাই অস্তিত্ববান। তাঁহাদের কেহ কেহ বলেন দেবতা ভিন্ন ভিন্ন নয়। একই দেবতাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে পূজা করা হইয়াছে মাত্র। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের অধিকাংশেরই মত প্রকৃতি-পূজাই বৈদিক ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব তবে কেহ কেহ বলেন কোন মানুষই জড় পূজা করিতে পারে না, এবং বৈদিক ঋষিও জড় প্রকৃতির উপাসক ছিলেন না। তাঁহারা প্রকৃতির পশ্চাতে শক্তি দেখিয়া তাঁহারই পূজা করিতেন।

সেনমহাশয় বৈদিক দেবগণকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম প্রকৃতি সম্পর্কীয় দেবতা, যেমন দ্যৌঃ, অগ্নি বরুণাদি। বিবস্বান, যম, ইন্দ্র, মরুৎ প্রভৃতি দেবতা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। ইঁহারা এক সময়ে পৃথিবীতে নররূপে বাস করিয়া

মহৎ কার্য্য দ্বারা খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পরে দেবপদে উন্নীত হইয়াছেন। এই শ্রেণীর দেবতাকে পরবর্ত্তী কালে কর্ম্ম দেবতা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ধাতা, শ্রদ্ধা, মন্যু প্রভৃতি দেবতা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। এই সমস্ত নাম গুণ-বাচক, এবং এই সমুদয় গুণকেই দেবরূপে উপাসনা করা হইত।

এক দেবতার পূজায় বৈদিক ধর্ম্মের আরম্ভ; এবং দ্যৌঃ সেই প্রথম দেবতা। ইঁহাকে তাঁহারা পিতা বলিতেন। তাহার পরে মাতৃরূপে পৃথিবীর পূজার আরম্ভ হইল। ঋকবেদে যদিও দ্যৌকে পিতা বলা হইত কিন্তু তবু একমাত্র তাঁহার উদ্দেশে কোন সূক্ত রচনা করা হয় নাই। দ্যাবা পৃথিবী অর্থাৎ দ্যৌঃ পৃথিবী এই উভয়কে একত্র পূজা করা হইত। সেনমহাশয় মনে করিতেন যে ইহার পরে সূর্য্যাদি দেবতার পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

যদিও কালক্রমে দেবতার সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছিল কিন্তু তবু ঋক্‌বেদেই একেশ্বরবাদেরও পরিচয় রহিয়াছে। অনেক ঋষি মনে করিতেন বিভিন্ন দেবতা, একই দেবতার ভিন্ন ভিন্ন নাম। কোন কোন মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে সমুদয় দেবতার ক্ষমতা একই। প্রজাপতি, বিশ্বকর্ম্মা ইত্যাদি দেবতাদের বিষয়ে যেরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা একেশ্বরবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে যে সমুদয় ঋক রচিত হইয়াছিল তাহাও একেশ্বরবাদের পরিচায়ক। সেনমহাশয় এই সমস্ত মতের ব্যাখ্যা করিয়া এসিয়াটিক জার্ণেলে Hero gods of the Rig

veda নামক প্রবন্ধ এবং ইষ্ট পত্রিকায় অনেকগুলি বৈদিক প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ঋকবেদ সম্বন্ধে তাঁহার একটি বক্তৃতা Idea of God in Rigveda নামে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সমস্ত প্রবন্ধে তাঁহার পাণ্ডিত্য, বিচার ও চিন্তাশীলতার বিশেষ পরিচয় রহিয়াছে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতামত সমালোচনা করিয়া তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা সহজে অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে না।

সেনমহাশয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ঋকবেদে ধর্ম্মের ক্রম বিকাশের পরিচয় রহিয়াছে। এই ধর্ম্ম এক দেবতার পূজায় আরম্ভ হইয়া পরে বহু দেবতার পূজায় এবং সর্ব্বশেষে একেশ্বরবাদে পর্য্যবসিত হইয়াছে। প্রাচীন উপনিষেদের ধর্ম্ম, ব্রহ্মবাদ, এবং বুদ্ধের নির্ব্বাণ ইহারও পরবর্ত্তী।

বাঁকুড়ায় অবস্থান কালে সেনমহাশয়ের সঙ্গে আমার সর্ব্বদাই শাস্ত্র অথবা ধর্ম্মালোচনা হইত। ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম সাহিত্যের আলোচনা ব্যতীত অপর কোন বিষয়ের আলোচনায় তাঁহার অনুরাগ ছিল না। দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায়ও তাঁহার অনুরাগ দেখিয়াছি। Kant, Hegel, Lotze এর দর্শন অতি মনোযোগের সহিত তিনি অধ্যয়ন করিতেন। শেষোক্ত দর্শনে তাঁহার অধিকতর মনোযোগ দেখিয়াছি। বলা বাহুল্য শুষ্কজ্ঞান তাঁহার শাস্ত্রালোচনার উদ্দেশ্য ছিল না, সুনির্ম্মলা ভক্তি লাভই উদ্দেশ্য ছিল। তিনি অনেক সময়ই বলিতেন—"নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ করণে।" কৃ ধাতুর অর্থ করা, ধাতু পাঠে কৃ ধাতুকে বলা হয় ডুকৃঞ। ইহার অর্থ করণে।

উক্ত শ্লোকার্দ্ধের অর্থ ডুকৃঞ করণে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না। সমস্ত শ্লোকটি এই—

"প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে
নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ করণে।"

অর্থ—মৃত্যু সন্নিহিত হইলে ডুকৃঞ করণে দ্বারা অর্থাৎ শুষ্ক জ্ঞানদ্বারা মুক্তি লাভ করা যায় না। মুক্তি লাভের জন্য সুনির্ম্মলা ভক্তিই নিত্য প্রয়োজন সেনমহাশয়ের ইহাই বলা উদ্দেশ্য। তাঁহার জীবনে এই ভক্তির বিকাশ হইয়াছিল। উপাসনা, আরাধনা, ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গে তাঁহার মধ্যে এই ভক্তির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

তাঁহার মুখে বৈষয়িক কথা কখনও শুনিতাম না। তিনি বিষয়মুক্ত ছিলেন। অপরের সমালোচনা হইতে তাঁহাকে একেবারেই নিরস্ত দেখিতাম। তাঁহার তুল্য মিত ও মিষ্টভাষী, বিনয়ী ও অমায়িক ব্যক্তি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

বিরোধী মত শুনিয়া তাঁহাকে কখনও উষ্ণ হইতে দেখি নাই। সর্ব্বদা ধীরতা রক্ষা করিয়া কথা বলিতেন। যে বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা তিনি কখনও সে বিষয়ে কথা উত্থাপন করিতেন না। মিলনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কথা বলিতেই তাঁহার অভ্যাস ছিল। আলাপ প্রসঙ্গে এমন মন খুলিয়া কথা বলিতেন যে উচ্চপদ কি নিম্নপদ বলিয়া কোন পার্থক্য রাখিতেন না।

সামাজিক উপাসনায় তিনি অত্যন্ত নিয়মিত ছিলেন। সর্ব্বদা উপস্থিত হইতেন। অনেক সময় তাঁহার উপর উপাসনার ভার

পড়িত। তিনি উপাসনা করিতেন, এবং আরাধনা, প্রার্থনা ও উপদেশাদিতে গভীর মগ্নভাবের পরিচয় দিতেন।

তাঁহার তুল্য সজ্জন ও ধার্ম্মিকের সঙ্গে বন্ধুতার সূত্রে আবদ্ধ হইয়া নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছি। তাঁহার গুণাবলী স্মরণ করিয়া যারপর নাই সুখানুভব করিতেছি। তাঁহার তুল্য সুসন্তান দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ লাভবান হইয়াছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রাচীনভারতে ঈশ্বরান্বেষণ। *

(৺অম্বিকাচরণ সেন প্রদত্ত বক্তৃতা)

হে পতিতপাবন দয়াল হরি, তোমার করুণার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। ঠাকুর, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কি প্রকারে তোমাকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন, অথবা তুমিই তাঁহাদিগকে অন্বেষণ করিয়াছিলে, তাহাই বলিবার জন্য আমি তোমার নিকটে এবং সমাগত ভ্রাতৃমণ্ডলীর নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। দেখিও, দয়া করিও, যেন আমার জ্ঞানের অল্পতা প্রযুক্ত কাহাকেও ভ্রমে না ফেলি। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

---

* ১৮৩০ শক ৫ই ভাদ্র শুক্রবার ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে প্রদত্ত বক্তৃতা অবলম্বনে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু লিখিত। ধর্ম্মতত্ত্ব ১০ই আশ্বিন ১৮৩০ শক।

ভারতে ঈশ্বরান্বেষণ কতদিন হইতে যে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অতি সুকঠিন। পুস্তক পাঠে যতদূর অবগত হওয়া যায়, কল্পনার সাহায্যে যতদূরে উপনীত হওয়া যায়, বোধ হয় যেন তাহারও পূর্ব্ব হইতে এই অন্বেষণ আরম্ভ হইয়াছে।

Bridgewater Treaty নামক গ্রন্থাবলীর মত এই যে দুইটী সমগুণ এবং ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুর সৌসাদৃশ্য দেখিয়া আমরা ঈশ্বরের করুণার পরিচয় পাই। মহাত্মা ডারউইন্ এতৎসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা আরও উপদেশজনক। তিনি বলিয়াছেন, দুইটী সমগুণবিশিষ্ট অথবা সমভাবাপন্ন অথবা সমধর্ম্মাক্রান্ত বিষয় বা বস্তু একই মহাকারণ হইতে উদ্ভূত। দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমন জননীর স্তনে দুগ্ধসঞ্চার এবং সেই দুগ্ধ পান করিয়া শিশুর জীবন ধারণ, এই দুই বিষয়ের মধ্যে পরস্পর গূঢ়যোগ দেখিয়া আমরা স্বভাবতঃই মুগ্ধ হই। কিন্তু ডারউইন্ বলিতেছেন মাতৃস্তনে দুগ্ধসঞ্চার এবং শিশুর স্তন্য পান করিয়া জীবন ধারণ এই দুই বিষয়ই এক কারণ হইতে উদ্ভূত। এই সিদ্ধান্ত ধরিয়া বিচার করিলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য অনুসন্ধিৎসা একই কারণজাত। অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন ইহা যেমন স্বাভাবিক, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য মনুষ্যের তাঁহাকে অন্বেষণ করাও তেমনি স্বাভাবিক।

এই স্বাভাবিকী প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ঊর্দ্ধস্থিত আকাশকে ঈশ্বর বলিয়া ধারণা করিয়া লইতেন। সে

সময়ে তাঁহাদের পক্ষে এরূপ করা কিছুই আশ্চর্য্যজনক ছিল না। কারণ তাঁহারা দেখিলেন যাহা কিছু পার্থিব তৎসমুদায়ই ধ্বংসশীল। একমাত্র আকাশই কেবল অবিনাশী। ইহার কূল নাই, কিনারা নাই, আদি অন্ত কিছুই নাই। ইহা এক মহান সত্ত্বামাত্র। এই আকাশকে তাঁহারা পিতা বলিয়া সম্বোধন করিলেন। এরূপ করিবার গূঢ় কারণ আমার এই মনে হয়, বোধ হয় তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, পুত্রের যেমন পিতা আছেন এবং পিতারও পিতা ছিলেন, এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতন পুরুষ পর্য্যন্ত উঠিতে উঠিতে শেষে তাঁহারা এমন একস্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন, যেখানে একমাত্র পিতা সেই আদি পিতা ভিন্ন আর কেহই রহিলেন না। তিনিই সকলের পিতা, তিনিই; সকলের স্রষ্টা, তাঁহা হইতে সমস্তই উদ্ভূত। এই আকাশই তিনি।

এইরূপ শুদ্ধ সত্ত্বামাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া জ্ঞানিগণ নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, কিন্তু অজ্ঞান যাঁরা তাঁহারা এই তত্ত্ব ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া বলিলেন "আমরা এরূপ একজন ঈশ্বর চাই যাঁহাকে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি এবং অল্পজ্ঞানের দ্বারা ধারণা করিতে সমর্থ হইতে পারি।" এই সময়ে যে ভাব আসিল তাহা কতকপরিমাণে অদ্বৈতবাদের ন্যায়। আকাশস্থিত চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্রাদি অন্ন, জল, অগ্নি, বায়ু সমস্তই ব্রহ্ম বলিয়া পূজিত হইতে লাগিল। অদ্বৈতবাদ হইতে এদেশে যে মহা অনিষ্টের উৎপত্তি

হইয়াছে, যে নাস্তিকতা এবং স্বেচ্ছাচারের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, সে সময়েও তাহাই ঘটিয়াছিল। ঈশ্বরকে সকলের অনায়াসলব্ধ করিয়া দিবার ফল এই হইল যে, চারিদিকে যথেচ্ছাচারের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। অনেক ভদ্রলোক ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্ধিহান হইলেন, অনেকে বিশ্বাস হারাইলেন এবং কেহবা বলিলেন, ঈশ্বর থাকেন থাকুন, আমাদের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। সোপেনহাউর বলিয়াছেন, ভারতের তৎকালীন ঋষিগণ সত্য ঈশ্বরকে ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া এই কল্পিত পন্থার অনুসরণ করিয়া আপনারা আত্মপ্রবঞ্চিত হইয়াছিলেন এবং অপরকেও ভ্রান্তির পথে লইয়া গিয়াছিলেন। এই ঘোর অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার কালে যাঁহারা ধর্ম্মের রক্ষক হইয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহাদের প্রতি আমরা যতই দোষারোপ করি না কেন, তাঁহাদের কৃত উপকার চিরদিন আমাদিগকে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতে হইবে এবং ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা স্মরণ করিবে।

এই শ্রেণীর লোকেরা ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইলেন। ইঁহারা বলিলেন, বিচার করিবার প্রয়োজন নাই, পূর্ব্বপুরুষগণ যেরূপ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন, ঋক পাঠ করিতেন, আমরাও তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত পথে চলিব। বেদের ব্রাহ্মণভাগ এই সময় রচিত হয়। ইহাতে এরূপ সকল যাগ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ আছে, যে তাহার কোন কোন বিষয় সায়নাচর্য্যও অনুমোদন করিতে পারেন নাই। কালক্রমে এই সকল যাগ যজ্ঞাদি কেবল অনুষ্ঠানমাত্রেই পর্য্যবসিত হইল।

নানাবিধ কুসংস্কার এবং পৌরহিত্যের ভাব আসিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহার জীবন্তভাব বিনষ্ট করিয়া ইহাকে কঙ্কালসার মৃত অনুষ্ঠান-ধর্ম্মে পরিণত করিল। কিন্তু মৃত্যুর পর নবজীবন যেরূপ অনিবার্য্য, সেইরূপ এই মৃতধর্ম্ম হইতেই জীবন্ত ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইল। যাগ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে বহুদেবদেবীর অর্চ্চনার পরিবর্ত্তে একেশ্বরের অর্চ্চনা প্রতিষ্ঠিত হইবার সূত্রপাত হইল। যাঁহারা এই অসার যাগযজ্ঞানুষ্ঠানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলেন, তাঁহারা ঈশ্বরের অন্বেষণে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন করিলেন, এবং তথায় নিমীলিতনেত্রে ঈশ্বরানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সকল আরণ্যক ঋষিগণ সাধন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, দেহের মধ্যে একটী বায়ু প্রতিনিয়ত ক্রিয়া করিতেছে এবং ইহারই প্রভাবে আমরা জীবিত আছি। এই বায়ু বা শক্তির নাম প্রাণ। এই প্রাণশক্তির প্রভাবে আমরা জীবিত আছি, এই প্রাণশক্তির প্রভাবে পশু, পক্ষী, বৃক্ষ লতাদি সকলেই জীবিত রহিয়াছে, এই প্রাণ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলেই আমাদের জীবনের শেষ হয়, অতএব এই প্রাণই ঈশ্বর। এইরূপে তাঁহারা প্রাণশক্তিকে জড়াইয়া ধরিলেন।

এই প্রাণের ঈশ্বরত্ব বিষয়েও বোধ হয় তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছিল, তাই তাঁহারা প্রাণের ঈশ্বরত্বকে দৃঢ়রূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য নিম্নলিখিত আখ্যায়িকাটি রচনা করিয়াছিলেন।

এক সময়ে প্রাণের সহিত হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয়গণের আপন আপন শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। তাহারা সকলে উক্ত

বিবাদের মীমাংসা করিবার জন্য প্রজাপতির সন্নিধানে উপনীত হইল, প্রজাপতি বলিলেন "এই বিবাদের মীমাংসা হওয়া অতি সহজ। তোমাদের মধ্যে যে কোন একজনের অভাবে দেহের ধ্বংস হইবে, সেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে।" এই কথা শুনিয়া চক্ষু দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। চক্ষু যাওয়াতে, দেহের সমধিক কষ্ট হইল বটে কিন্তু একেবারে নাশ হইল না। অন্ধের দিন যেরূপ যায় সেইরূপে তাহার দিন কাটিতে লাগিল। এইরূপে কর্ণ নাসিকা জিহ্বাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তাহাতে দেহের একবারে বিনাশ হইল না। কিন্তু সর্ব্বশেষে প্রাণ যখন দেহকে ত্যাগ করিবার উপক্রম করিল, তখন হস্তপদাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়া পড়িল এবং তখনই তাহারা বুঝিতে পারিল যে প্রাণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে ঈশ্বরের সকল নামের মধ্যে কোন নামটি সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট এবং নিকটতর। তিনি বলিলেন প্রাণ। বাস্তবিক এই প্রাণের তুল্য প্রিয়বস্তু আর আমাদের কি আছে! তাই বোধ হয় অমন ক'রে ঋষিরা ঈশ্বরকে প্রাণ নামে অভিহিত করিয়া এরূপ তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রাণকে তাঁহারা মুখ্যপ্রাণ, প্রথম প্রাণ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু শক্তি বিশেষকে ঈশ্বর বলিয়া ধারণা করিয়া রাখা কতদিন চলিতে পারে। ঈশ্বর

যিনি আত্মার পরমাত্মীয়, যিনি অন্তরতর অন্তরতম, তাঁহাকে সেই ভাবে না উপলব্ধি করিতে পারিলে কি পিপাসু প্রাণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারে? তাই সাধকপ্রাণে নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। এই আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া সাধকগণ আবার নূতন ভাবে সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সাধনার ফলস্বরূপ তাঁহারা ঈশ্বরকে আত্মারূপে জানিতে পারিলেন। এই সময় হইতেই উপনিষদের ধর্ম্মের আরম্ভ হইল।

এতদিন ঈশ্বর কেবল অন্বেষণের বিষয় ছিলেন, এখন হইতে তিনি সম্ভোগের বস্তু হইলেন। এতদিন ধর্ম্ম Deismএ আবদ্ধ ছিল, এখন হইতে Theism আরম্ভ হইল। আত্মা শব্দটি সংস্কৃত। ইহার তাৎকালিক প্রচলিত ভাষা আত্মা। জৈন শাস্ত্রে ইহার প্রতিশব্দ অপ্পা এবং বাঙ্গালা অর্থ আপন। উপনিষদ বলিলেন ঈশ্বর আত্মা। অর্থাৎ ঈশ্বর আমার আপনি। তিনি প্রাণস্য প্রাণম্, চক্ষুষশ্চক্ষু, শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্, মনসো মনঃ। অর্থাৎ তিনি আমার প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র এবং মনের মন। একজন ঋষি বলিলেন হে শ্বেতকেতো! তিনিই তুমি। অর্থাৎ তিনি ছাড়া তোমার কোন প্রকার স্বাতন্ত্র্য নাই। আর একজন ঋষি বলিলেন আমিই তিনি। অর্থাৎ আমার বলিতে কিছুই নাই, তিনিই আমার সর্ব্বস্ব। তিনি ছাড়া আমি অসারের অসার। এইরূপে ঋষিগণ আত্মারূপে ভগবানকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন বটে, কিন্তু অতঃপর যাহা হইল তাহাতে আকাশ চিদাকাশে পরিণত হইল,

সত্যস্বরূপ ঈশ্বর জ্ঞানম্ হইয়া ঋষিগণের অন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। ভাবে আপন, কার্য্যেতে আপন হইলেন। গুরু হইয়া উপদেষ্টা হইয়া, পরিচালক হইয়া সাধককে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। সাধকের সহিত ঈশ্বরের নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। ঋষিগণ যে ঈশ্বরকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাহা নিম্নলিখিত আখ্যায়িকাটি হইতে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে।

জনৈক ঋষির নিকট কোন শিষ্য শিক্ষার্থ গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু ঋষি কোন দিন তাঁহাকে কোন প্রকার উপদেশ দেন নাই। একদিন ঋষিপত্নী তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তিনি কোন প্রকার উত্তর না দিয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কিছুদিন পরে তিনি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার অনুপস্থিতিতে কি তোমার কোন উপদেশের অভাব হইয়াছিল।" শিষ্য বলিলেন "যখনই আমার উপদেশের প্রয়োজন হইত আমি আমার হৃদিস্থিত গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতাম এবং তাঁহার সদুত্তর লাভ করিতাম।" ঋষি এই কথা শুনিয়া হৃষ্টমনে তাঁহাকে গৃহে বিদায় দিলেন।

প্রায় সকল মহাপুরুষগণের সম্বন্ধেই দেখা গিয়াছে তাঁহারা স্বয়ং কখনও গুরুর স্থান অধিকার করিয়া বসেন নাই। কিন্তু যে কেহ তাঁহাদের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাকেই যাহাতে তিনি হৃদিস্থিত জ্ঞানদাতা গুরুর শরণাপন্ন হইতে পারেন তদ্বিষয়েই শিক্ষা দান এবং সহায়তা

করিয়াছেন। নির্ব্বাণ প্রচারক বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে বর্ণিত আছে, কোন ব্যক্তি এক সময়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি যে বলিয়া থাকেন পবিত্র চিন্তা কর, পবিত্র বাক্য বল, পবিত্র আচরণ কর, পবিত্রভাবে জীবনযাপন কর, তাহা কি প্রকারে সাধন করিতে হইবে তদ্বিষয়ে আমাকে উপদেশ দান করুন।" তিনি তাহাকে বলিলেন "অদ্য আমি তোমাকে কিছু বলিব না, তুমি আগামী কল্য আমার নিকট আসিও।" পরদিন সে ব্যক্তি যথাসময়ে তাঁহার নিকট আসিয়া উপনীত হইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "গতকল্য তুমি কি ভাবে যাপন করিয়াছিলে?" তিনি বলিলেন "আমি আপনার নিকট কোন উপদেশ না পাইয়া আমার মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ বিচারশক্তি আছে তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম এবং যে আলোক লাভ করিলাম তদনুসারেই চলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, ইহাতে দেখিলাম যে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি।" তিনি তাঁহাকে সেই পথই অবলম্বন করিতে উপদেশ দিলেন।

ঋষিগণ ঈশ্বরকে জ্ঞানস্বরূপ গুরুরূপে বুঝিতে পারিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হইলেন, জীবনের কার্য্যে তাঁহার প্রেরণা অনুভব করিয়া এবং তাঁহার আদেশ পালন করিয়া চলিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রাণে প্রকৃত শান্তি উপভোগ করিতে পারিলেন না। কারণ যিনি শান্তি স্বরূপ, যিনি আনন্দময়, তাঁহাকে জানিতে এবং জীবনে লাভ করিতে না পারিলে আনন্দ কোথা হইতে আসিবে। তাই তাঁহারা পুনরায় সেই জ্ঞানদাতা

গুরুর শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহারই কৃপায় বুঝিতে পারিলেন, তিনি আনন্দময়, তিনি অমৃতময়, তিনি রসরূপ। তাঁহাদের মুখ হইতে তখনই উচ্চারিত হইল "আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হইয়া আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মেতে স্থিতি করে এবং অন্তে সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মেতেই প্রতিগমন করে।" এইরূপে ঋষিগণ আদিতে সৎ, মধ্যে চিৎ এবং অন্তে আনন্দস্বরূপ রূপে ঈশ্বরকে লাভ করিলেন।

উপনিষদাদি গ্রন্থেতে ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু আদৌ ঋষিগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মশব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা জানা আবশ্যক। প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মশব্দের অর্থ ছিল ঋক অথবা গাথা। তৎপরে ব্রহ্মশব্দ ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ যিনি সর্ব্বব্যাপী তিনি ব্রহ্ম। ব্রাহ্মসমাজ যখন ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিলেন, তখন অনেকে এই বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন যে ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে না। কারণ তিনি নির্গুণ, তুরীয় এবং আপনার স্বরূপে আপনি অবস্থিত। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ এরূপ ব্রহ্মের উপাসনা করেন না। ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপধারী লীলারসময় শ্রীহরি। ইনি প্রাচীন ভারতে সৎ, চিৎ এবং আনন্দরূপে ঋষিগণের নিকট ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আত্ম প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইনিই বর্ত্তমান যুগে তাঁহার একেশ্বরবাদী একেশ্বরবাদিনী পুত্র কন্যাগণের নিকট সচ্চিদানন্দরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

নির্ব্বাণ-ধর্ম্ম। *

(৬ অম্বিকাচরণ সেন প্রদত্ত বক্তৃতা)

দুঃখী জগতকে, দুঃখ চিরদিনের জন্যে যায় কিরূপে, এই সুসমাচার বলিবার জন্যে কিঞ্চিদধিক ২৫০০ বৎসর হইল কপিল-বাস্তু নগরে যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় দুইটি। ১। তিনি কি বস্তু নিজ জীবনে লাভ করিলেন ? ২। ধর্ম্ম বিধানে তাঁহার স্থান কি ? অর্থাৎ পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী ধর্ম্ম বিধানের সঙ্গে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম বিধানের সম্পর্ক কি ? এই দ্বিতীয় প্রশ্ন আলোচনা করিবার আজ আমাদের অবসর হইবে না। প্রথম বিষয়টি মাত্র আজ আমরা আলোচনা করিব।

এই আলোচনা আমাদিগের একটুকু নূতন প্রণালীতে করিবার ইচ্ছা। অনেক সময়েই দেখা যায় যে মহাজনগণের ধর্ম্ম লোকে দর্শন শাস্ত্রের নিস্পাদ্য একটী বিষয়ের ন্যায় আলোচনা করেন। এই প্রণালীতে তাঁহাদের ধর্ম্মকে খণ্ড খণ্ড করিয়া এখানে একটি কথা, ওখানে একটি উপদেশ, অন্যত্র একটি কার্য্য পৃথকরূপে আলোচনা করা হয়। পরে দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্রের সাহায্যে একটি সামঞ্জস্য প্রদর্শন করা হয়। নির্ব্বাণধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদিগের এই প্রণালী অবলম্বনের অধিকার নাই। কারণ এই ধর্ম্ম যাঁহার জীবনে প্রথম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল তিনি স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন

* ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, ২৫শে মে, ১৯১০ সন।

যে দর্শনশাস্ত্রদ্বারা ইহা বোঝা যায় । ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনও কিছু পূর্ণরূপে বুঝিবার একটীমাত্র উপায় উহা সাধন ও জীবনে উপলব্ধি। কিন্তু আমাদের মত সামান্য লোক সম্বন্ধে ইহা সম্ভব নহে।

আর একটি উপায় আছে যাহা দ্বারা ধর্ম্মতত্ত্ব পূর্ণরূপে না জানিতে পারিলেও অনেক পরিমাণে তৎসম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান লাভ সম্ভব। এ পথ সরল ও সহজ। এ পথে সামান্য মলিন মানব সেই গুরুর গুরু অনন্ত জ্ঞানময় পরমেশ্বরের কৃপায় ও শক্তিতে তাঁহাতে পটে অঙ্কিত আলেখ্যের ন্যায় মহাজন চরিত্রের আরম্ভ ও বিকাশ চিত্রিত দেখিতে পারে। যাঁহারা এ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন এবং বিন্দুমাত্র ইহার রসাস্বাদ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন সামান্য মানুষকে মহাজনগণের ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানের জন্যে ভগবানের হস্তে এটি একটী শিক্ষা প্রণালী। Kinder-garten প্রণালীর সঙ্গে ইহার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। এ প্রণালীর অবলম্বন করিয়া আমরা নির্ব্বাণ-ধর্ম্মের দুই একটী কথা বলিবার জন্যে আপনাদিগের নিকটে উপস্থিত হইলাম।

যেমন অন্য অন্য মহাজনগণ সম্বন্ধে হইয়াছে এবং হইতেছে, শাক্যসিংহের সম্বন্ধেও সেইরূপ হইয়াছে। তাঁহার জীবনচরিত লেখকগণ, তাঁহার সরল স্বাভাবিক জীবনকে অতিরঞ্জিত ও অস্বাভাবিক করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ নানা আবর্জ্জনায় জড়িত হইয়াও সেই বিশুদ্ধ একমাত্র সত্যের সুবিমল কিরণে গঠিত জীবন ঢাকিয়া যায় নাই। তিনি হিমালয়ের পাদদেশে,

কপিলবাস্তু নগরে, সাংসারিক সুখের নানা উপকরণের মধ্যে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু শিশুর জীবনের প্রথম কথা সুখজনক নহে—গভীর দুঃখে পূর্ণ। মাতৃবিয়োগ। দশমাস গর্ভে ধারণ করিয়া যিনি শিশুকে প্রসব করিলেন, তাঁহার ভাগ্যে, ক্ষুদ্র শিশুর সঙ্গে পরিচয় করিয়া প্রসবকারিণী জননীর যে সুখ, সে সুখ হইল না। ভৌতিক জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান—মাতার বক্ষে শিশুর ক্ষুদ্র দেহ মন প্রাণ ছাড়িয়া দিয়া, সমস্ত জগৎ হইতে বিমুক্ত হইয়া, দৃশ্য জগতে নির্ব্বাণের যে অতুল চিত্র প্রদর্শন—বুদ্ধের ভাগ্যে তাহা ঘটিল না।

এই ঘটনা শাক্যের ক্ষুদ্র হৃদয়কে যেরূপে আঘাত করিয়াছিল, তাঁহার জীবনের উপরে দীর্ঘকাল যেরূপে আধিপত্য করিয়াছিল আর কাহারো সম্বন্ধে সেরূপ আমরা জানি না। এই শোক তাঁহাকে এক ঘন বিষাদসাগরে ডুবাইল। বিষণ্ণতায় এক ঘন কালিমা শিশুর প্রফুল্লমুখকে আচ্ছন্ন করিল।

এই বিষণ্ণতার জন্যে পিতার অতুলবিভবপূর্ণ গৃহে তিনি নির্লিপ্ত বালকসন্ন্যাসী হইলেন। কোন আমোদ আহ্লাদ ক্রীড়া কৌতুকে তিনি যোগ দান করিতেন না। সজন পরিত্যাগ করিয়া তিনি নির্জ্জনে চলিয়া যাইতেন। একদিন বালক শাক্যকে রাজবাটীতে পাওয়া গেল না। হুলস্থূল পড়িয়া গেল। অনেক অনুসন্ধানের পর দেখা গেল যে তিনি এক জম্বুবৃক্ষের নীচে বসিয়া নিমিলিত চক্ষু হইয়া কি ভাবিতেছেন। ক্রমেই তাঁহার বিষণ্ণতা ও সন্ন্যাসীর ভাব বিকাশ পাইতে লাগিল। পিতা

শুদ্ধোদন উদ্বিগ্ন হইলেন—অনেকের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে যৌবন কাল উপস্থিত হইলেই তাঁহাকে এক পরমাসুন্দরী সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা স্ত্রী বিবাহ করাইলেন এবং এক পরম রমণীয় উদ্যানবাটিকা পুত্র ও পুত্রবধূর বাসের জন্য প্রদান করিলেন। এখানে কোনও রকম দুঃখপূর্ণ দৃশ্য যাহাতে না থাকে, বহির্জগত হইতে কোনও শোকসংবাদ যাহাতে না আসে তাহার বন্দোবস্ত করিলেন। কথিত আছে যে উদ্যান মধ্যে একটী শুষ্কপত্রও থাকিতে পাইত না যাহা দেখিয়া শাক্যের কোমল হৃদয়ে দুঃখের ছায়া পড়িতে পারে। কিন্তু আর একজনের ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। তাঁহার ইচ্ছা কেহ বাধা দিতে পারে না। তিনি রাজার রাজা, প্রভুর প্রভু।

কথিত আছে একদিন শাক্য পিতার অনুমতি লইয়া নগর দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। রাজার আজ্ঞায় সমস্ত নগর সুসজ্জিত করা হইল। নগরের নরনারী এক মহোৎসবের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রাজকুমারের অভ্যর্থনার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। শাক্য সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিয়া নগরের মধ্যদিয়া গমন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী ও বৃক্ষরাজিতে পরিশোভিত এক পথে রমণীয় স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন পথের এক পার্শ্বে, শাক্য এক জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধকে দেখিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন “ছন্দক, এই শ্বেতকেশ, দৃষ্টি নিম্নদিকে অবনত, জ্যোতিহীনচক্ষু, জীর্ণ-শীর্ণদেহ, শুষ্কচর্ম্ম পুরুষ যে নিজের ভার বহন করিতে না পারিয়া যষ্টির উপরে ভর দিয়া অতি কষ্টে

চলিতেছে, এ কে? ইহার শরীর কি রৌদ্রোত্তাপে হঠাৎ শুকাইয়া গেল, না ইহার জন্মই এইরূপ?"

অভিজ্ঞ সারথি কুমারের প্রশ্ন শুনিয়া চমকিত হইলেন। প্রথমতঃ যথার্থ উত্তর প্রদানে সমর্থ হইলেন না। কিছুকাল পরে বলিলেন "ইহার আকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—শক্তিসামর্থ্য চলিয়া গিয়াছে, এ সকল বার্দ্ধক্যের লক্ষণ। এক দিন এ শিশু ছিল, প্রফুল্লমনে মাতৃস্তন্য পান করিত। পরে বাল্যে ক্রীড়া কৌতূহল আমোদ আহ্লাদে কাল যাপন করিয়াছে। যৌবন কালে ইহার বীর পরাক্রম, স্থূলোন্নত দেহ, মনের আনন্দ, উৎসাহ উদ্যম ছিল। এখন তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধকালে উপস্থিত।

শুনিয়া কুমার চিন্তিত হইলেন। তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল। মন চঞ্চল হইল। পুনর্ব্বার মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছন্দক, বার্দ্ধক্য কি শুধু এই লোকেরই উপস্থিত হইয়াছে? না সকল মানুষেরই এইরূপ হয়। আমার ও তোমার সকলেরই এইরূপ হইবে"? ছন্দক ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "কুমার, সকলেরই এইরূপ হইবে।" শাক্য বলিলেন, "আমার হৃদয় দুঃখপূর্ণ হইয়াছে, শীঘ্র রথ ফিরাইয়া উদ্যান বাটিকাতে লইয়া চল"।

এই কথা যখন শুদ্ধোদনের কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনি প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন। পরে আজ্ঞা করিলেন পুনর্ব্বার নগরকে সুসজ্জিত কর: আরো ভাল করিয়া সুন্দর করিয়া নগর বিভূষিত

কর এবং বিষণ্ণচিত্ত কুমারকে পুনরায় নগরের শোভা দেখিতে লইয়া যাও। তাহাই করা হইল। কুমার অধিকতর সাজ সজ্জায় সুসজ্জিত কপিলবাস্তু নগরী দেখিতে পুনর্ব্বার বহির্গত হইলেন। এবার পথপ্রান্তে স্ফীতশরীর, বিকৃতদেহ এক রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিলেন। সে রোগ যন্ত্রণায় অতি কষ্টে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন "ছন্দক, এ আবার কে? সারথী উত্তর প্রদান করিলেন "এ ব্যাধিগ্রস্ত লোক। এ এক সময়ে সুস্থ ছিল। ইহার শরীর সবল ও সুন্দর ছিল। রোগগ্রস্ত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।" কুমার পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন "শুধু এই ব্যক্তিই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে, না সকলেরই এইরূপ হয়?" ছন্দক উত্তর করিলেন "দেহধারী মাত্রেরই সময়ে সময়ে ব্যাধিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা।"

কথিত আছে, আর একবার কপিলবাস্তু নগরী সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। নগর হইতে কুৎসিত যাহা কিছু দূর করা হইয়াছিল। জরাব্যাধিগ্রস্ত লোক সকল অন্যত্র নীত হইয়াছিল। তখন শাক্য তৃতীয়বার কপিলবাস্তু নগরী প্রদক্ষিণ করিতে বহির্গত হন। এবার তিনি তাঁহার রথের সম্মুখ দিয়া চারিজন লোকে কি স্কন্ধে করিয়া যাইতেছে দেখিতে পাইলেন। তাহারা যাহা লইয়া যাইতেছে তাহা রঞ্জিত বস্ত্রদ্বারা আবৃত এবং পুষ্পদ্বারা সুসজ্জিত। কিন্তু সঙ্গে যাহারা যাইতেছে তাহারা ক্রন্দন ও বিলাপ করিতেছে। যেন কি এক মহা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। কুমার কিছু বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ছন্দক এরা

কি লইয়া যাইতেছে ?" সারথী বলিলেন—"এরা সৎকার করিবার জন্য একটী মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইতেছে। এ ব্যক্তির মরণ হইয়াছে। প্রাণবায়ু দেহ হইতে চলিয়া গিয়াছে। এখন তাহার দেহ স্পন্দহীন। এদেহ রক্ষা করা যায় না, রক্ষা করিবার আবশ্যকতাও নাই। দগ্ধ করিয়া এই দেহ পঞ্চভূতে মিশাইয়া না দিলে অল্পকাল মধ্যে পূতিগন্ধ বিস্তার করিয়া পচিয়া যাইবে।" কুমার আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "ছন্দক এই ব্যক্তিই শুধু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, না সকলেরই মরিতে হয় ?" ছন্দক বলিলেন "জন্ম হইলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যার জন্ম হইয়াছে অল্প বা অধিক কাল পরে সে নিশ্চয়ই মরিবে।"

এই ঘটনা তিনটী "ললিত-বিস্তার", অশ্ব ঘোষের "বুদ্ধ-চরিত" এবং অন্যান্য গ্রন্থে যেরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে শাক্যসিংহের জীবনে ঠিক সেই ভাবেই ঘটিয়াছিল আমরা একথা বলিতে চাই না। সম্ভবতঃ এরূপ ভাবে ঘটে নাই। কিন্তু মানুষের জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু চিন্তা করিয়া তিনি যে এক মহা দুঃখসাগরে ভাসিয়াছিলেন তাহার কোনও সন্দেহ নাই। তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন যে প্রত্যেক মানুষ জরা ও ব্যাধিগ্রস্ত হয় এবং অল্প বা অধিকদিন পরে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় অথচ পৃথিবীর লোক এরূপ ভাবে আমোদ আহ্লাদে দিন কাটায় যে এই তিন যেন তাহাদের জীবনের অতি ঘোরতর সত্য নহে। অতি শিশুকালে গর্ভধারিণী জননীকে হারাইয়া তিনি হৃদয়ে এক মহা আঘাত পাইয়াছিলেন। এখন দেখিলেন জরা, ব্যাধি, মৃত্যু

প্রত্যেক মানুষের জীবনের অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। এই বিষয় চিন্তা করিয়া অতুল বিভব, পিতা ও বিমাতা প্রজাবতীর অপার স্নেহ, সাধ্বী, গুণবতী সহধর্ম্মিণীর অপার প্রেম কিছুই তাঁহার জীবনে সুখ প্রদান করিতে সমর্থ হইল না। একটুকু চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব কেন এইরূপ হইল। যদি মৃত্যুই মানুষের জীবনের শেষ কথা হয় দুই দিনের সুখই কি আর দুঃখই কি? অতুলনীয় সুন্দর দেহই কি, আর নিতান্ত কুৎসিত শরীরই কি?

এই যে দুঃখের দিক দর্শন, এ সম্বন্ধে শাক্যকে এই বলিয়া অনুযোগ করিলে চলিবে না যে তিনি দুঃখের দিক অতিমাত্র দেখিয়াছিলেন এবং সুখের দিক, আলোর দিক দেখেন নাই। কারণ যুগে যুগে মহাজনগণের জীবনে এই হইয়াছে। শুদ্ধ তাহা নহে। যাঁহারা ধর্ম্মের ইতিহাস মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা বলিবেন এখানেই ধর্ম্মের—এখানেই ঈশ্বরান্বেষণের মূল কারণ। মানুষ এই পার্থিব জীবনে, এই চারিদিকের দৃশ্যমান জগতে, এমন কিছুর অভাব দেখিতে পাইল যে সে এই সমস্তের অতীত এক মহা সত্যের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। সামান্য মানুষ এই অভাব তত বুঝিতে পারে না, সুতরাং সত্যান্বেষণে তাহার আগ্রহ তত জন্মে না। শাক্য এই অভাব হৃদয়ের স্তরে স্তরে, পরমাণুতে পরমাণুতে অনুভব করিয়াছিলেন—প্রবল বহ্নিতে নিমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় হইয়াছিলেন—বাণবিদ্ধ মৃগশাবকের ন্যায় হইয়াছিলেন। সুতরাং সত্যের অন্বেষণে তাঁহার আগ্রহ মহোচ্চ পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ প্রবল স্রোতস্বতীর ন্যায় শক্তিশালী হইয়াছিল। এই

আগ্রহের প্রথম বিকাশ মহা বৈরাগ্য, যাহা দেখিয়া আজও পৃথিবী বিস্মিত। আর একটি কথা, যাহা বলিলাম ইহারই অন্তর্গত অথচ শাক্যের ধর্ম্ম বুঝিতে হইলে ইহার পৃথক্ চিন্তার প্রয়োজন। জীবনের অতি প্রত্যূষেই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে মৃত্যুজরাব্যাধির অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে এমন কিছু চাই যাহা এই সকলের অধীন নহে ; এবং যখন চক্ষু, কর্ণ, শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত পদার্থই মৃত্যুর অধীন সেই পদার্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। তাহা যে শূন্য নহে ইহা বুঝিতেও তাঁহার অধিক বিলম্ব হইল না।

এই যে কয়েকটা কথা বলিলাম, আমি জানি আপনাদের মধ্যে অনেকেই বলিবেন, এগুলি তোমার নিজের চিন্তা, নিজের কথা, শাক্যসিংহের জীবনে এরূপ হইয়াছিল কে বলিল ? এই কয়েকটা কথা যাহা বলা হইল তাহা এখনই আপনারা গ্রহণ কর ন অথবা আমার কোনও কথা গ্রহণ করুন, আজ তজ্জন্য অনু করিতে আসি নাই। আজ আসিয়াছি আপনাদিগের নিকটে শাক্যসিংহের জীবনের কতকগুলি ঘটনা এবং তাঁহার নিজের কতকগুলি কথা উপস্থিত করিব মনে করিয়া। তর্কযুক্তি করিতে হয়, আলোচনা করিতে হয়, আমি যে সকল গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিব সেই সমস্ত নিজ চক্ষুদ্বারা দেখিতে হয়, আপনাদের নিজেদেরই করিতে হইবে। আমি যাহা বলিলাম তাহা বোধসৌকর্য্যার্থে, তাহা নির্ঘণ্টরূপে ব্যবহার করিলে বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে।

উপরে দুইটি কথা বলা হইয়াছে। (১) সংসারের রোগ

শোক জরা মরণের দুঃখ দেখিয়া শাক্যসিংহ অস্থির হইয়াছিলেন। (২) সংসারে যে দুঃখ তাহা এই সকল পদার্থ অনিত্য বলিয়া। সুতরাং দুঃখ অতিক্রম করিতে হইলে এই সকলের অতীত নিত্য পদার্থ লাভ করা চাই।

এই যে তাঁহার জীবনের ঠিক কথা, পালি গ্রন্থে তাহার রাশি রাশি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা তাহার প্রধান প্রধান কয়েকটির উল্লেখ করিব।

"হে ভিক্ষুগণ মৃত্যুদেবের তিন দূত। তারা কে? এই পৃথিবীতে ভিক্ষুগণ, একজন কায়দ্বারা, বাক্যদ্বারা এবং মনের দ্বারা দুষ্কর্ম্ম করিয়া জীবনধারণ করে। সে এইরূপ করিয়া দেহের অবসানে মৃত্যুর পরে চতুর্ব্বিধ দণ্ডভোগের জন্য নরকে উপস্থিত হয়। নরকপালগণ তাহাকে অনেক বাহুদ্বারা ধৃত করিয়া রাজা যমের নিকটে এই বলিয়া প্রদর্শন করে, হে দেব এই লোক তাহার বন্ধুগণ সম্বন্ধে, পিতামাতা সম্বন্ধে, শ্রমণগণ সম্বন্ধে অথবা ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে ইহার কর্ত্তব্য করে নাই এবং ইহার নিজ কুলের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে সম্মান করে নাই। দেবতা ইহাকে দণ্ডবিধান করুন। তখন হে ভিক্ষুগণ, রাজা তাহাকে প্রথম যমদূত সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, অনুসন্ধান করেন এবং বলেন।

হে পুরুষ, তুমি কি মানুষের মধ্যে প্রথম দেবদূতের উপস্থিতি সন্দর্শন কর নাই? সে এইরূপ উত্তর করে—"প্রভু আমি সন্দর্শন করি নাই।" যম রাজা তখন তাহাকে বলেন "হে পুরুষ, তুমি কি মানুষের মধ্যে কোন নর বা নারীকে অশীতিবর্ষ, নবতিবর্ষ অথবা

শতবর্ষে জীর্ণ, গোশালার চালার ন্যায় বক্র, অবনতাঙ্গ, যষ্টি-অবলম্বিত, কম্পিতদেহ, আতুর, বিগতযৌবন, ভগ্নদন্ত, পলিতকেশ, লোলিতচর্ম্ম, স্খলিতপদ, বলিযুক্ত কুঞ্চিতললাট সন্দর্শন কর নাই?" সে বলে "প্রভু আমি দেখিয়াছি।" তখন হে ভিক্ষুগণ, যমরাজা তাহাকে বলেন "হে পুরুষ তুমি বৃদ্ধ হইয়াছিলে, তোমার অনেক জ্ঞান জন্মিয়াছিল, তুমি কি মনে কর নাই, আমিও জরাধর্ম্ম গ্রস্ত, জরাধর্ম্মের অনতীত, হায়, আমি কায়দ্বারা বাক্যদ্বারা মনের দ্বারা দুষ্কর্ম্ম না করিয়া কল্যাণ করিব।" সে উত্তর করে—"প্রভু প্রমাদবশতঃ এরূপ করিতে পারি নাই।"

তাহাকে যমরাজা এইরূপ বলেন "হে পুরুষ, তুমি প্রমাদ-বশতঃ কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা কল্যাণ করিতে সমর্থ হও নাই। নিশ্চয় হে পুরুষ, তোমার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করা হইবে প্রমত্ততার জন্যে তুমি যাহার উপযুক্ত। এই পাপকর্ম্ম তোমার মাতা করেন নাই, তোমার পিতা করেন নাই, তোমার ভ্রাতা করেন নাই, তোমার ভগিনী করেন নাই, তোমার আত্মীয় স্বজন, তোমার জ্ঞাতিগণ, দেবতাগণ, শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণগণ করেন নাই। এই পাপ কর্ম্ম তুমি স্বয়ং করিয়াছ এবং তুমি স্বয়ং ইহার দণ্ড ভোগ করিবে।"

উপদেশে দ্বিতীয় দূত ব্যাধি, এবং তৃতীয় দূত মৃত্যু সম্বন্ধেও এইরূপ বলা হইয়াছে। শাক্যসিংহ নিজে জরামৃত্যুব্যাধি দেখিয়া ভীত হন এবং পাপ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাচরণ করেন ও

কল্যাণের পথ অবলম্বন করেন; তাই অন্যকেও সেইরূপ করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি যাহা বলিতেছি তাহা শ্রমণই হউক বা ব্রাহ্মণই হউক অন্য কাহারো নিকটে শ্রবণ করিয়া বলিতেছি না। হে ভিক্ষুগণ, যাহা আমি স্বয়ং জানিয়াছি, স্বয়ং দেখিয়াছি ও বুঝিয়াছি তাহাই বলিতেছি।" *

মজ্‌ঝিমনিকায়ে "অরিয়পরিয়েসনা সুত্ত" নামক একটি উপদেশ আছে। আমরা যাহা জানিতে চাই তৎসম্বন্ধে এই উপদেশের তুলনা হয় না। এই উপদেশকে বুদ্ধদেবের আত্মজীবনী বলিলেও বলা যায়। অঙ্গুত্তর নিকায়ে এই উপদেশের উল্লেখ ও প্রধান প্রধান অংশ আছে। উপদেশটির নামের অর্থ এই। অরিয়—সংস্কৃত আর্য্য। ইহার অর্থ প্রথমে আর্য্য জাতির নাম ছিল, পরে পূজনীয়, শ্রেষ্ঠ, মঙ্গলজনক ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এষণা—ইষ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইহার অর্থ অন্বেষণ ও ঐকান্তিক বাসনা। এই দুই অর্থ মূলে একই। আমরা যাহা চাই তার অন্বেষণ করি। বুদ্ধদেব উপদেশ দিতেছেন;—

"হে ভিক্ষুগণ, এষণা দুই প্রকারের, আর্য্য এষণা এবং অনার্য্য এষণা। হে ভিক্ষুগণ, অনার্য্য এষণা কাহাকে বলে? এই পৃথিবীতে একজন স্বয়ং জন্মের অধীন অথচ জন্মাধীন বস্তুই অন্বেষণ করে, স্বয়ং জরাধর্ম্মের অধীন অথচ জরাধর্ম্মশীল বস্তুরই অন্বেষণ করে, স্বয়ং ব্যাধির অধীন অথচ ব্যাধিধর্ম্মশীল বস্তুর অন্বেষণ করে, স্বয়ং

* অঙ্গুত্তর নিকায়।

মরণশীল অথচ মরণশীল বস্তুর অন্বেষণ করে, স্বয়ং শোকের অধীন হইয়া শোকধর্ম্মের অধীন বস্তুর অন্বেষণ করে, স্বয়ং পাপ-প্রবৃত্তির অধীন হইয়া পাপপ্রবৃত্তির অধীন বস্তু অন্বেষণ করে।

কোন্ বস্তুকে জাতিধর্ম্মের অধীন বলা যায়? পুত্র এবং ভার্য্যা হে ভিক্ষুগণ জাতিধর্ম্মের অধীন; দাস, দাসী জাতিধর্ম্মের অধীন; হস্তী, গো, অশ্ব, বড়বা জাতিধর্ম্মের অধীন; অজ, এড়ক, (মেষ) জাতিধর্ম্মের অধীন; কুক্কুট ও শূকর জাতিধর্ম্মের অধীন; বংশমর্য্যাদা, রৌপ্য ও সুবর্ণ জাতিধর্ম্মের অধীন। এই সমস্তই জাতিধর্ম্মের অধীন এবং ইহাদের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া, মুগ্ধ হইয়া, মগ্ন হইয়া এই পুরুষ স্বয়ং জাতিধর্ম্মের অধীন হইয়া, জাতিধর্ম্মের অধীন এই সকল বস্তু কামনা করে।

এই সকল বস্তু জরাধর্ম্মের অধীন, মরণধর্ম্মের অধীন, শোক-ধর্ম্মের অধীন, পাপপ্রবৃত্তির অধীন। হে ভিক্ষুগণ, মানুষ এই সকল দ্বারা মুগ্ধ হইয়া, আবদ্ধ হইয়া, এই সকলেতে মগ্ন হইয়া, স্বয়ং জাতি, জরা, মরণ, ব্যাধি, শোকধর্ম্ম ও পাপপ্রবৃত্তির অধীন হইয়া এইরূপ ধর্ম্মের বস্তু অন্বেষণ করে। এই অনার্য্য কামনা।

হে ভিক্ষুগণ, আর্য্য কামনা কাহাকে বলে? এই পৃথিবীতে একজন স্বয়ং জাতিধর্ম্মের অধীন, তিনি নিজের সদৃশ জাতি-ধর্ম্মের অধীন বস্তুতে দুঃখ সন্দর্শন করিয়া জন্মরহিত, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগক্ষেম সর্ব্বাশ্রয় নির্ব্বাণ কামনা করিয়া থাকেন। স্বয়ং ব্যাধিধর্ম্ম, জরাধর্ম্ম, মরণধর্ম্ম, শোকধর্ম্ম, পাপপ্রবৃত্তির অধীন হইয়া এই সকলের অধীন, সমস্তপদার্থে দুঃখ সন্দর্শন করিয়া জরা, মরণ, শোক, পাপের

অতীত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বাশ্রয় নির্ব্বাণ কামনা করিয়া থাকেন। এই আর্য্য কামনা।

আমিও ভিক্ষুগণ, এক সময়ে সমাধিদ্বারা প্রবুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে স্বয়ং জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, শোক, পাপের অধীন হইয়া এই সকলের অধীন বস্তু সমুদয় কামনা করিয়াছিলাম। পরে আমার অন্তরে এই প্রশ্নের উদয় হইল। কেন আমি স্বয়ং এইরূপ কামনা করিতেছি? কেন আমি স্বয়ং এইরূপ কামনা করি নাই

তার পর অপর সময়ে যখন আমার অল্প বয়স ছিল, বালকের ন্যায় কৃষ্ণকেশ ছিল, পূর্ণযৌবন ছিল, মাতাপিতার অসম্মতিতে তাঁহাদের অশ্রুপূর্ণ মুখ সন্দর্শন করিতে করিতে কেশ ও শ্মশ্রু-কর্ত্তন করিয়া, কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলাম।”

মজ্‌ঝিমনিকায়ের প্রথম সূত্র “সর্ব্বধর্ম্মমূল পরিয়ায়ে” বুদ্ধদেব বলিতেছেন ;—“হে ভিক্ষুগণ সকল ধর্ম্মের মূল কি প্রদর্শন করিব। হে ভিক্ষুগণ এই পৃথিবীতে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী কোন ব্যক্তি যে আর্য্যধর্ম্মের কথা শুনে নাই, আর্য্যধর্ম্ম কি তাহা জানে না, আর্য্যধর্ম্মদ্বারা যার চিত্ত বিনীত হয় নাই, যে সাধুপুরুষকে দেখে নাই, সাধু পুরুষের ধর্ম্ম জানে না, সাধুপুরুষের ধর্ম্মদ্বারা যাহার চিত্ত বিনীত হয় নাই, সে এই পৃথিবীতে থাকিয়া এই পৃথিবী নিত্যপদার্থ মনে করে, এই পৃথিবী আমার আত্মা এই মনে করে, এই পৃথিবী হইতে আমি উৎপন্ন হইয়াছি এইরূপ মনে করে এবং ইহার প্রশংসা করে। কেন এইরূপ করে, অজ্ঞানতা বশতঃ

এইরূপ করে। তস্সাতি বদামি। তাহার অতীত বিষয়ের কথা বলিব।

আপ, তেজ, বায়ু, ভূত, দেবতা, প্রজাপতি, ব্রহ্মং, আভাস্সর (=S. আভাস্বর shining gods—vasws), সুভকিগ্ন (S. শুভকৃৎস্ন নবমরূপ ব্রহ্ম লোকের দেবতা), বেহপ্পফল (বৃহৎফল), অভিভূ—সর্ব্বলোকজয়ী, আকাস-নঞ্চায়তনং, বিঞ্ঞাণঞ্চায়তনং, আকিঞ্চঞ্ঞায়তনং, নেবসঞ্ঞানাসঞ্ঞায়তনং, দিটঠং, সুতং, মুতং, বিঞ্ঞাতং, একত্তং, নানত্তং, সব্বং, নিব্বাণং, পরে স্রোতাপন্ন ভিক্ষু, অর্হত।

সম্যক সম্বুদ্ধ তথাগত এই সমস্ত জানেন কিন্তু তাহাদেরে নিত্য বলেন না, আত্মা বলেন না, উৎপত্তির কারণ বলেন না। তস্সাতি বদামি তাহার অতীত বলিতেছি।

নন্দি দুক্খস্সমূলং তি ইতি বিদিত্বা, ভবাজাতি, ভূতস্স জরা মরণন্তি তস্মাতিহ ভিক্খবে তথাগতো সব্বসো তণ্হানং খয়া বিরাগা নিরোধা চাগা পটিনিসগ্গা অনুত্তরং সম্মাসম্বোধিং অভি-সম্বুদ্ধ তি বদামীতি।

এই সমস্তে দুঃখ দর্শন করেন এবং এই সমস্তের অতীত পদার্থ অন্বেষণ করেন। এরা দুঃখময় কারণ এরা অনিত্য।

তং কিম্ মঞ্ঞসি রাহুল, চক্ষুং নিচ্চং বা অনিচ্চং বাতি। অনিচ্চং ভন্তে। যং পনানিচ্চং দুক্খং বা তং সুখং বা'তি। দুক্খং ভন্তে। যং পনানিচ্চং দুক্খং বিপরিণামধম্মং, কল্লং নু তং সমনুপ-

স্মিন্তং এতং মম, এসো হম্ অস্মি, এতো মে অত্তা তি। ন হেত্তং জন্তে।

সোতং, ঘানং, জিহ্বা, কাযো, মনো এবং পস্সং, রাহুল, সুত্তবা আরিস্পাবকো চক্খুস্মিম্ নিব্বিন্দতি নিব্বিন্দম, বিরজ্জতি, বিরাগা বিমুচ্চতি,বিমত্তস্মিম্ বিমুত্ত ইতি ঞাণং হোতে। খীণা জাতি বুসিতা ব্রহ্মচারয়ম কতং করণীয়ং নাপরং ইত্থত্তায়াতি পজানাতীতি।" *

দ্বিতীয় কথা ভৌতিক জগতের অতীত সর্ব্ব সন্তাপহারক সেই বস্তু লাভের জন্যে তিনি কি উপায় অবলম্বন করিলেন? তাঁর লক্ষ্য এবং পূর্ব্ববর্ত্তী নৈসর্গিক শক্তির আধারভূত অগ্নি বরুণ, ইন্দ্র, বায়ুর পূজা এ দুয়ের বিভিন্নতা বুঝিলেই আমরা সেই সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারিব যে তাঁহার সাধন প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন হইবে। দেব দেবীর পূজায় তাঁহার লক্ষ্যসিদ্ধির পক্ষে কোন লাভ নাই। কারণ এ সমস্ত জন্ম মৃত্যুর অধীন এবং তিনি চান জন্মমৃত্যুর অতীত বস্তু লাভ করিয়া জন্মমৃত্যুজনিত দুঃখ অতিক্রম করিতে। যাগ, যজ্ঞ, প্রাচীন তপস্যা অর্থাৎ কৃচ্ছ্র সাধনে তাঁহার লাভ নাই কারণ এ সমস্ত ভৌতিক পদার্থ লইয়া। তিনি যে একবারেই এ কথা বুঝিয়াছিলেন তাহা নয়। তিনি প্রথমে প্রাচীন প্রণালী অগ্রাহ্য করেন নাই।

(১) প্রথমে আনারকালাম এর নিকটে উপদিষ্ট হইলেন। সাধন করিলেন। আকিঞ্চঞ্ঞায়তনং World of nothing-

* সংযুক্ত নিকায় রাহুল সংযুক্তং মহাবগ্গো।

ness. "নায়ং ধম্মো নিব্বিদায়, ন বিরাগায়, ন নিরোধায়, উপসমায়, ন অভিঞ্ঞায়, ন সম্বোধায়, ন নিব্বানায় সংবত্তি যাবদ্‌এব আকিঞ্চঞ্ঞায়তনূপপত্তিয়াতি"।

(২) পরে উদ্দকরাম পুত্রের নিকটে যান। নেবসঞ্ঞানাসঞ্ঞায়তনং। The world neither of perception nor of non-perception.

(৩) উরুবিল্বের জঙ্গলে—প্রাচীন তপস্যা, কৃচ্ছ্রসাধন, প্রাচীন যোগ, প্রাণায়াম, আস্কানক, মধ্য পথ। নিরাশা ও সিদ্ধি।

(৪) প্রথম প্রচার—ইসিপটনা। (a) বাসনার নির্ব্বাণ—(১) অরিয়পরিএসনা, অনঅরিয় পরিএসনা। (২) কুসলধম্মে আসক্তি, অকুসলধম্মে অনাসক্তি।

অষ্টাঙ্গ মগ্গ—সম্যা দিঠি—সত্য ধর্ম্ম মত, সম্যা সংকল্প—সত্য ইচ্ছা, সম্যা বাচা—সত্য কথন, সম্যা কম্মন্তো—সত্য কর্ম্ম, সম্যা আজীবো—জীবনোপায় সত্য, সম্যা বায়ামো, সম্যা সতি—স্মৃতি, সম্যা সমাধি।

(১) দুঃখ, (২) দুঃখের কারণ—বাসনা, (৩) দুঃখের নিবৃত্তি—বাসনার বিনাশ, (৪) অষ্টাঙ্গ মার্গে চলিয়া দুঃখের বিনাশ।

(1) দান—Charity (2) শীল—Conduct (3) শান্তি—ক্ষমা (4) বীর্য্য—Effort (5) ধ্যান—Meditation (6) প্রজ্ঞা—সত্যদর্শন।

সমস্ত সাধনার মূলকথা ইন্দ্রিয়গ্রামে মুগ্ধ মনকে উন্নত করা।

নির্ব্বাণ কি ? অন্য ভাষায় এই প্রশ্ন করিতে হইলে বলিতে হয় বিশাল আয়োজন হইয়াছিল, শাক্যসিংহ এই দৃশ্যমান জগতের অতীত, সর্ব্বসন্তাপহারক কোনও কিছু লাভ করিবার জন্য মহা বৈরাগ্যের বস্ত্র পরিধান করিয়া গার্হস্থ্য জীবনের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া মহা প্রয়াণ করিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষকগণের শরণাপন্ন হইলেন। দিন আসিল যখন এ আশ্রয়ও পরিত্যাগ করিলেন—অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী হইলেন, মহা তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এত মানুষের দিক, এত রোগ-যন্ত্রণায় অস্থির রোগীর রোগমুক্ত হইবার জন্যে যথাসাধ্য প্রয়াস ও চেষ্টা। কিন্তু প্রশ্ন এই, তিনি কি কিছু পাইলেন, কেহ কি রোগীর ভীষণ চীৎকারে কোন উত্তর প্রদান করিলেন ?

১। নৈরঞ্জনারতীরে কি হইল ? যাহা গ্রন্থে পাওয়া যায় তাহা এই ;—মহাতপস্যা, কৃচ্ছ্রসাধন, মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ, নিরাশা, ক্রন্দন, অন্যপথ অবলম্বন। মারের প্রলোভন। সিদ্ধি। এখানে পরিষ্কার কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।

২। কাশী যাত্রা, উপাক, মুখের জ্যোতি, ব্রহ্মজ্যোতি। কবির—"তার আঁখি হরিগুণ বখানে।" উপকোশল son of কমলা, সত্যকাম জাবাল। "ব্রহ্মবিদঃ ইব সৌম্য তে মুখং ভাতি।"

৩। ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনসূত্র,—প্রথম প্রচার। আমি "আচার্য্য, বুদ্ধ, তথাগত হইয়াছি। তোমাদের বন্ধু গৌতম মরিয়াছেন। আমার ন্যায় সাধন কর ইহ জীবনেই নির্ব্বাণ লাভ করিবে"।

বাসনা হইতেই সব দুঃখ। বাসনার নির্ব্বাণ। এ বাসনা এই দৃশ্যমান জগত সম্বন্ধে। ইহার অতীত বস্তু সম্বন্ধে নহে।

এ অনার্য্য পর্য্যেষণা, আর্য্য পর্য্যেষণা নহে। অকুশল ধর্ম্মে আসক্তি, কুশল ধর্ম্মে নহে।

৪। শ্রাবস্তীতে এক সময়ে ভগবান বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ বিষয়ে একটী উৎসাহপূর্ণ উপদেশ দেন। মার মনে করিল তার রাজত্ব যায় যায়। তাই বুদ্ধদেবকে তর্কের অন্ধকারে ফেলিবার জন্যে প্রকাণ্ড এক লাঙ্গল স্কন্ধে চাষা সাজিয়া উপস্থিত হয় এবং বলে "অর্হত্ আমার বলদ দেখিয়াছ ?" বুদ্ধ বলিলেন "মন্দবুদ্ধি, তুমি বলদ দ্বারা কি করিবে ?" মার বলিল "সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম আমার; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মনের রাজ্য আমার; তুমি কিরূপে আমাকে অতিক্রম করিবে ?"

বুদ্ধ বলিলেন "যেখানে চক্ষু, মন যায় না সেখানে তোমার স্থান নাই।"

মার বলিল "যে রাজ্যে লোকে বলে এই আমার, আমি এই সকল, যদি তোমার মন সে রাজ্যে যায় সেখানে আমি।"

বুদ্ধ বলিলেন "আমি এরূপ বলি না; যেখানে কিছুই আমার নয়, কিছুই আমি নই, সেখানে তোমার গতি নাই।"

৫। বাহেয়া সুত্ত। ধর্ম্মনিষ্ঠ, ধর্ম্মপিপাসু। একবার, দুই বার, তিন বার। সংক্ষেপে ব্যাখ্যা। "দিট্ঠে দিট্ঠমত্তং ভবিষ্যতি, সুতে সুতমত্তং ভবিষ্যতি; মুতে মুতমত্তং ভবিষ্যতি; বিঞ্ঞাতে বিঞ্ঞাতমত্তং ভবিষ্যতি। এবঞ্ হি বাহিয় সিক্খিতব্বং। যতো খো তে, বাহিয়, দিট্ঠে দিট্ঠমত্তং ভবিষ্যতি। বিঞ্ঞাতে বিঞ্ঞাতমত্তং ভবিষ্যতি, ততো ত্বং

বাহিয়, ন তৎথ, যতোত্বং বাহিয়, নেব অৎথ, ততো ত্বং বাহিয় নেব ইধ, ন হুরং ন উভয়মন্তরেন। এস্ এব্ অন্তো দুঃখস্সাতি। সব্রহ্মচারী বো ভিক্খবে কালংকতো'তি।

যৎথ আপো চ পঠবী তেজো বায়ো ন গাধতি,
ন তৎথ সুক্কা জোতন্তি আদিচ্চোন প্পকাসতি,
ন তৎথ চন্দিমা ভাতি তমো তৎথ ন বিজ্জতি।
যদা চ অত্তন আবেদি মুনি মোনেন ব্রাহ্মণো,
অথ রূপা অরূপা চ সুখদুক্খা পমুচ্চতীতি" ॥

৬। এক সময়ে বুদ্ধদেবের কোন উৎকট পীড়া হইয়াছিল। আরোগ্যের পরে প্রথম দিন তাঁহার জন্য বিহারের পশ্চাদ্ভাগে আসন পাতা হইল। তিনি উপবিষ্ট হইলে আনন্দ বলিলেন ;— "প্রভু আমি অন্ধকার দেখিতেছিলাম, আপনি উপদেশ দিয়া যাইতে পারিবেন—সঙ্ঘের জন্যে নিয়ম করিয়া যাইতে পারিবেন!" "আনন্দ আমি সব কথা বলিয়াছি। গোপন রাখি নাই। মুষ্টি বুদ্ধ গুরু নই। আনন্দ সঙ্ঘের লোকেরা। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, বয়স অশীতি বর্ষ, জীর্ণশকট। সুখ ও আরাম শুদ্ধ এই সকলের অতীতে, সমাহিতঅন্তরে বিহার করিলে।

তস্মাতিহানন্দ অত্তদীপা বিহরথ অত্তসরণা অনঞ্ঞসরণা ধম্মদীপা ধম্মসরণা অনঞ্ঞসরণা ॥"

শেষ কথা—"হে ভিক্ষুকগণ, সাবধান হইয়া শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি, সকল যৌগিকবস্তু ক্ষয়শীল, একাগ্রচিত্ত হইয়া সাধন কর।"

৭। "পণ্ডুপলাসোহ্বহদানিহসি, যমপুরিসাহপি চ তং উপট্ঠিতা।
উয্যোগমুখে চ তিট্ঠসি, পাথেয্যম্পি চ তেন বিজ্জতি।"

"তুমি এখন জীর্ণ পত্রের ন্যায় হইয়াছ। যমদূতগণ তোমার নিকটে উপস্থিত। তুমি যাবার পথে দাঁড়াইয়া আছ এবং তোমার পাথেয়ও নাই। সো করোহি দীপমত্তনো"।

৮। "অরিয়স্স অট্ঠংগিকস্স মগ্গস্স অধিবচনং। ব্রহ্মযানং ইতী'পি। ধম্মযানং ইতী'পি। অনুত্তরো সংগামবিজয়ো ইতী'পি"।

৯। "সুতং মেতং ভো গোতমঃ সমণো গোতমো ব্রহ্মাণং সহব্যতায় মগ্গং জানাতীতি। তং কিম মঞ্ঞসী বাসেট্ঠ? আসন্নে ইতো মনসাকটং? ন ইতো দূরে মনসাকটন্তি। এবং ভো গোতম, আসন্নে ইতো মনসাকটং, ন ইতো দূরে মনসা কটন্তি। তং কিম্ মঞ্ঞসি বাসেট্ঠ? ইধ' অস্স পুরিসো মনসাকটে জাতোবদ্ধো তম এনং মনসাকটতো তাবদ্ এব অবস্সটং মনসাকটস্স মগ্গং পুচ্ছেয্যুং। সিয়া খো বাসেট্ঠ তস্স পুরিসস্ মনসাকটে জাতবদ্ধস্স মগ্গং পুট্ঠস্স দন্ধায়িতত্তং বা বিৎথায়িতত্তং বা তি"।

"নো হি'দং ভো গোতম। তং কিস্স হেতু? অমু হি ভো গোতম পুরিস মনসাকটে জাতোবদ্ধো, তস্স সবধান্ এব মনসা কটস্স মগ্গানি সুবিদিতানীতি।

সিয়া খো বাসেট্ঠ তস্স পুরিস্স মনসাকটে জাত-বদ্ধস্স মনসাকটস্স মগ্গং পুট্ঠস্স দন্ধায়িত্তং বা বিৎথায়িত্তং বা, নো ত্বেব তথাগতস্স ব্রহ্মলোকে বা ব্রহ্মলোক-গামিনিয়া বা পটিপদায়

পুরিসস্স সন্ধাবিতুং বা বিধাবিতুং বা। ব্রহ্মানং পনাহং বাসেট্ঠ পজানামি। ব্রহ্মলোকং চ ব্রহ্মলোকগামিনিং চ পটিপদং যথা পটিপন্ন চ ব্রহ্মলোকং উপ্ পন্ন তং চ পজানামীতি" ।

এখানে একটি কথা ; এখানে যে ব্রহ্মের কথা বলা হইল একি হিন্দু ঋষিদিগের স্বয়ম্ভূ, নিত্য, অজ ব্রহ্ম (ক্লীবলিঙ্গ) না এই ব্রহ্মেরদ্বারা সৃষ্ট ব্রহ্মা (পুং ব্রহ্মা)। এই দ্বিতীয় অর্থে ব্রহ্মশব্দ এখানে হইতে পারে না। কারণ :—(১) ব্রহ্মশব্দ যে অজ, নিত্য, স্রষ্টা অর্থে হিন্দুরা ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহার সঙ্গে মিলন যে তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল বুদ্ধ ইহা জানিতেন।

"ব্রহ্মভূতো অতিতুলো, মারসেন প্রমদ্দনো,
সব্বামিত্তে বসীকত্বা, মোদামি অকুতোভয়ো।
ব্রহ্মভূতো অতিতুলং, মারসেন প্রমদ্দনং,
কো দিস্বা ন-প্পসীদেয়্য, অপি কণ্হাভিজাতি কো"।

(১০) অগ্গিবচ্ছগোত্তসুত্তং। মজ্ঝিমনিকায়।

"অলং হি বচ্ছ অঞ্ঞাণায় অলং সম্মোহায়। গম্ভীরো হ'অয়ং বচ্ছ ধম্মো দুদ্দসো দুরনুবোধ সন্তো পণিতো অতক্কাবচরো নিপুণো পণ্ডিতবেদনিয়ো, সো।"

"বচ্ছ ঢের হইয়াছে, এবিষয়ে জানিতে প্রয়াস পাইয়া তুমি আপনাকে উত্ত্যক্ত করিও না, এবং আরো অধিকতর অন্ধকারে পতিত হইও না। এই ধর্ম্ম গম্ভীর, ইহার ধারণা ও অনুভূতি কঠিন, সত্য, শ্রেষ্ঠ, তর্কের অতীত, স্পর্শ করা কঠিন, শুদ্ধ বুদ্ধিমানগণ বুঝিতে সমর্থ। তোমার নিকটে আরও কঠিন—

তোমার চিন্তা, কার্য্য, ধারণা, বিশ্বাস, সাধনা অন্যরূপ, অন্য শিক্ষকের নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া। অতএব তোমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া আমি তোমাকে প্রশ্ন করিতেছি। তুমি যা সঙ্গত মনে কর উত্তর প্রদান কর।

"বচ্ছ তুমি কি মনে কর তোমার সম্মুখে যদি অগ্নি জ্বলিতে থাকে তুমি কি বুঝিবে না অগ্নি জ্বলিতেছে?"

হাঁ গৌতম আমার সম্মুখে অগ্নি জ্বলিলে আমি বুঝিব অগ্নি লতেছে। "যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে সম্মুখস্থ অগ্নি কিসের উপরে নির্ভর করে, তুমি উত্তর দিতে পারিবে?" হাঁ, অগ্নি তৃণ ও কাষ্ঠের উপরে নির্ভর করে। "যদি তোমার সম্মুখস্থ অগ্নি নিবিয়া যায় বুঝিবে অগ্নি নিবিয়াছে?" হাঁ। "কিন্তু যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে অগ্নি যে নিবিল তাহা গেল কোথায়? উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্বে না পশ্চিমে?" না গৌতম এ সঙ্গত প্রশ্ন নহে। তৃণ কাষ্ঠ দগ্ধ অগ্নির জ্বালা নির্গত হইতেছিল, তৃণ কাষ্ঠ নিঃশেষ হইল, নিবিয়া গেল। "ঠিক সেইরূপে সর্ব্বপ্রকার রূপ যাহা দ্বারা আমরা বলিতেছি তথাগত আছেন, সে রূপ মূলসহ উৎপাটিত তালবৃক্ষের ন্যায় চিরদিনের জন্য বিনাশ পাইল।"

"এবং এব খো বচ্ছ যেন রূপেন তথাগতং পঞ্ঞাপয়মানো পঞ্ঞাপেয্য তং রূপং তথাগতস্স পহিনং উচ্ছিন্নমূলং তালাবত্থু কতং অনভাবকতং আয়তিং অনুপাদধম্মং। রূপসংখা বিমুত্তো খো বচ্ছ তথাগতো গম্ভীরো অপ্পমেয্যো দুপ্পরিযোগাহো সেয়্যথাপি মহা সমুদ্দো উপপজ্জতীতি ন উপেতি; ন উপপজ্জতীতি

ন উপেতি ; উপপজ্জাতি চ ন চ উপপজ্জাতীতি ন উপেতি ; ন' এব উপপজ্জাতি ন ন উপপজ্জাতীতি ন উপেতি। যয়া বেদনায়, যয়া সঞ্ঞায়, যেহি সংখারেহি, যেন বিঞ্ঞানেন।

অত্থি ভিক্খবে তদ্ আয়তনং, যত্থ ন' এব পঠবী ন আপো ন তেজো ন বায়ো ন আকাসানঞ্চায়তনং ন বিঞ্ঞাণানঞ্চায়তনং ন আকিঞ্চঞ্ঞায়তনং ন নেবসঞ্ঞানাসঞ্ঞায়তনং ন আয়ং লোকো ন পরলোকো উভো চন্দিম সূরিয়া তদ্ অহং ভিক্খবে ন'এব আগতিং বদামি ন গতিং ন ঠিতিং ন চুতিং ন উপপত্তিং অপপতিট্ঠং অপ্পবত্তং অনারম্মণং এব তং এস্ এব অন্তো দুক্খস্স'তি।

অত্থি ভিক্খবে অজাতং অভূতং অকতং অসংখতং, নো চে তং ভিক্খবে অভবিস্স অজাতং অভূতং অকতং অসংখতং, ন বিধ জাতস্স ভুতস্স কতস্স সংখতস্স নিস্সরণং পঞ্ঞায়েথ। যস্মা চ খো ভিক্খবে অত্থি অজাতং অভূতং অকতং অসংখতং তস্মা জাতস্স ভূতস্স কতস্স সংখতস্স নিস্সরণং পঞ্ঞায়তী'তি।"

যাহা বলা হইল তার সার মর্ম্ম এই—

১। এই পৃথিবীতে তিনি, জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু জনিত দুঃখ দেখিয়া অস্থির হইলেন। এ দুঃখ দেখিয়া আমরা সকলেই অল্পাধিক ভীত হই, দুঃখিত হই। কিন্তু তাঁর দুঃখ অসহ্য হইল। সঙ্গে সঙ্গে আশা হইল, এই সকলের অতীত, এই সকলের অধীন নহে, এমন কিছু আছে যাহা পাইলে এই দুঃখ হইতে নির্ম্মুক্ত হওয়া যায়।

২। গৃহ পরিত্যাগ করিলেন, অনেক সাধন করিলেন, অনেক সাধন পরিত্যাগ করিলেন। পরে বুঝিলেন সেই সর্ব্বসন্তাপহারক বস্তু পাইতে হইলে অন্য সমস্ত বাসনার বিনাশ চাই ও জীবন সম্পূর্ণ শুদ্ধ হওয়া চাই। পরে সিদ্ধি।

৩। যাহা পাইলেন তাহা প্রকাশ করিতে য[illegible]য়া ভয়ানক সঙ্কটে পড়িলেন। এই সময়ে জগৎ ও জগতের অতীত বস্তু সম্বন্ধে শত শত মত আসিয়াছিল। (ব্রহ্মজালসু[illegible]) অনেক সময়ে "নির্ব্বাণ" এই শব্দদ্বারা প্রকাশ করিলেন। ফল এই হইল যে এই শব্দ দুই ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইল।

(১) সকল বস্তুর বিনাশ—শূন্য।

(২) দৃশ্যমান জগতের অতীত বস্তু যাহা ম[illegible]কে অমর করে, অকুতোভয় করে। যাহা অজাত, অভূত, অকৃত, অসংখত এবং অন্য সমস্ত জাত, ভূত, কত, সংখত।

কখন ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কখন আত্মা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আত্মা শব্দও দুই অর্থে। ১। ব্যক্তিগত আত্মা। ২। নিত্য আত্মা।

মূল কথা বুদ্ধদেবের সঙ্গে এবং অন্য লোকের সঙ্গে বাস্তবিক (১) বিভিন্নতা এ নহে যে তিনি বলেন ঈশ্বর নাই এবং অন্যে বলেন ঈশ্বর আছেন। বিভিন্নতা এই—অন্যে বলে ঈশ্বরও আছেন অন্য সব জিনিষও আছে। তিনি বলেন ঈশ্বরই আছেন। তিনি বলেন এমন অবস্থা আছে যাহা লাভ করিলে রূপ, রস, গন্ধ [illegible] কখন

মানুষ আছেও বলা যায় না, নাইও বলা যায় না। কারণ যে সকল লক্ষণদ্বারা আমরা মানুষ আছে বলি তাহা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়। তখন মানুষ নাইও বলা যায় না কারণ তখন সে ইন্দ্রিয়গ্রামের অতীত বস্তুতে সমাধিস্থ হইয়া—তন্ময় হইয়া গম্ভীর, অপ্রমেয়, দুষ্পরিগ্রাহ্য মহা সমুদ্রের ন্যায়। তাঁর ও অন্য লোকের মধ্যে বিভিন্নতা এই। (২) অন্য লোকে এই ইন্দ্রিয়গ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত, সম্পর্কিত ভগবানের যে রূপ তাই দেখিতে চায়, তাই দেখিতে পাইলেই পরিতৃপ্ত হয়—তাহাদের ভগবানের নিকটস্থ হইয়াও এই ইন্দ্রিয়গ্রাম থাকে, বুদ্ধদেব প্রথম হইতেই এই ইন্দ্রিয়গ্রামের অতীত বস্তু দর্শনের জন্য লালায়িত হন; তাহার জন্যে পৃথিবীর সমস্ত আদরের জিনিষ পরিত্যাগ করেন। আর একটুকু হইলে এ দেহও পরিত্যাগ করিতেন। সেই বস্তু সম্বন্ধে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যে হিরণ্যগর্ভ জননী এই অত্যাশ্চর্য্য পরম সুন্দর জগৎ প্রসব করিয়াছেন তিনিও আপনার ন্যায় সুন্দর কোনও কিছু সৃষ্টি করিতে সমর্থ নন। এই রূপ সেই দেখিতে পায় যে তাঁর জন্যে অন্য সমস্ত বিসর্জ্জন করিয়াছে।

মার বলিল "যে রাজ্যে লোকে বলে, এই সকল আমার, আমি এই সকল যদি তোমার মন সে রাজ্যে যায় আমি সেখানে।"

বুদ্ধ বলিলেন "আমি এরূপ বলি না। যেখানে কিছুই আমার নয়, কিছুই আমি নই সেখানে তোমার গতি নাই।"

(৩) তাঁহার ও অন্যের মধ্যে প্রভেদ এই। অন্যে গুরুর মুখে শুনিয়া, শাস্ত্র পাঠ করিয়া, আভাস মাত্র পাইয়া, ধর্ম্মের

কথা, সত্যের কথা, ব্রহ্মের কথা বলে, তিনি ইহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া প্রথমে সাক্ষাৎকার করেন। তাই বলিয়াছেন ;—

"আমি সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। আমি ব্রহ্মীভূত হইয়াছি। ব্রহ্মলোকে আমার জন্ম হইয়াছে। ব্রহ্মলোকে আমি বাস করি। আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি।"*

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

পৃথিবীর কর্ম্মের শেষ দিন নিকটবর্ত্তী হইল। উপর হইতে বিধাতার অব্যর্থ আহ্বান আসিল। কিন্তু অম্বিকাচরণের দৃষ্টি সকল অবস্থায় ইহপরলোকের সেতুস্বরূপ, জীবনের নিয়ন্তা কর্ম্ম-প্রবাহের প্রবর্ত্তক পরমেশ্বরে সতত নিবদ্ধ ছিল। ইহাতে মৃত্যুকে তাঁহার ভয় নাই। মৃত্যু তাঁহার সম্মুখে পরলোকের দূত, এবং অমৃতের সোপান।

ধর্ম্মদৃষ্টি জন্যই যৌবন হইতে তাঁহার মৃত্যুর স্মৃতি জাগ্রত

---

* বক্তা মুখে অনেক কথার পরিষ্কার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সব লিখেন নাই। তাই প্রবন্ধের স্থানে স্থানে অস্পষ্ট রহিয়াছে। অনেক স্থলের অনুবাদও অনুল্লেখ রহিয়াছে। বক্তৃতাটি যে আকারে লিখিত ছিল সেইরূপই মুদ্রিত হইল।

দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। বারবার মৃত্যু স্মরণ করিয়া যেন আত্মদৃষ্টি উজ্জ্বল করিয়া লইতেন। পত্নীর প্রবল ভালবাসার মধ্যেও তাঁহাকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া এই শিক্ষাই দিয়াছেন পৃথিবীর সম্পর্ক যথেষ্ট নয়, আর তাহা লইয়া কখনও চিরদিন সুখী হওয়া যাইবে না। পৃথিবীর সম্পর্কের সঙ্গে অনন্ত প্রেমাধার পরমেশ্বরের প্রেম যুক্ত করিয়া তাহাকে অচ্ছেদ্য করিতে হইবে। তবেই মৃত্যুভয় তিরোহিত হইবে।

অম্বিকাচরণ যৌবন ও প্রৌঢ় অতিক্রম করিলেন। যদিও রোগে তাঁহার দেহ ভগ্ন এবং কর্ম্মক্ষেত্র হইতে তাঁহাকে অবসর লইতে হইল, কিন্তু তবু তাঁহার উৎসাহের লাঘব হইল না। কার্য্য হইতে অবসর লইয়া বিশ্রাম এবং চিকিৎসা দ্বারা স্বাস্থ্যের কিঞ্চিৎ উন্নতি হইলেই তিনি তাঁহার প্রিয় ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের আলোচনায় এবং ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মে ভাল করিয়া নিযুক্ত হইলেন। কৃষির প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ জন্য দেশের সেবা উদ্দেশ্যে যতদূর সাধ্য কৃষির জন্যও পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর এইভাবে গত হইলে ১৯১০ সনে পুনরায় তাঁহার রোগের বৃদ্ধি হইল। তখন কোন প্রকার চিকিৎসায় সুফল না হওয়ায় বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আলমোড়া গমন করিলেন।

সেবা, যত্ন, সুবন্দোবস্ত যতদূর হইতে পারে সকলই হইল, কিন্তু ফল বিশেষ হইল না। কয়েক মাস পরে প্রবল শীতের জন্য লক্ষ্ণৌ নামিয়া আসিয়া সেখানে কিছুদিন চিকিৎসা করাইলেন; এবং পরিবর্ত্তন না হওয়ায় কলিকাতায় আসিতে বাধ্য হইলেন।

চিকিৎসকবর্গের পরামর্শে অবশেষে ওয়ালটেয়ার সমুদ্রতীরেও কতক দিন বাস করিলেন। কিন্তু রোগের দিন দিন বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। ওয়ালটেয়ারে অনেক সময় 'বাড়ী যাব' বলিয়া ব্যস্ত হইতেন। কিন্তু তাঁহার জন্য যে বড় বাড়ী প্রস্তুত হইতেছিল কাহারও তাহা মনে আনিতে ইচ্ছা হয় নাই। রোগের বৃদ্ধি দেখিয়া অক্টোবরের প্রথমেই (১৯১১) তাঁহাকে কলিকাতা আনা হইল। গৃহে আসিলে তাঁহার বন্ধু প্রকাশচন্দ্র পরিবারের সকলকে লইয়া উপাসনায় বসিলেন, তাঁহার শরীর অক্ষম জানিয়া তাঁহাকে আর উপাসনাস্থলে আসিতে বলিলেন না। কিন্তু উপাসনার নামে তাঁহার দুর্ব্বল দেহেও বল আসিত। তাই আপনা হইতেই উপাসনাস্থানে আসিলেন ও প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন—"গৃহে আসিয়াছি, কিন্তু এ গৃহ ত নিত্যগৃহ নয়। তোমার ইচ্ছায় নিত্যগৃহে যাইতে হইবে। তুমি সেই গৃহের জন্য প্রস্তুত কর।"

রোগের মধ্যে অনেক সময়ই তিনি বলিতেন "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" বিশ্বাসী জীবনের ইহা অপেক্ষা আর বড় প্রার্থনা কি? পৃথিবীর শেষদিন নিকটবর্ত্তী বুঝিয়াই দর্শনার্থী বন্ধুদিগকে বলিতেন "আমি চলিলাম।" কন্যাকে 'হরিবল হরি চল যাই বাড়ী' গান শুনাইতে বলিতেন। গৃহের দ্রব্যাদি লক্ষ্য করিয়া বলিতেন "এ সকলে আর আমার কোন অধিকার নাই।" অমর লোকের যাত্রী আত্মার পৃথিবীর নশ্বর বস্তুতে প্রয়োজনই কি আর অধিকারই বা কি এই জ্ঞানই যেন জাগ্রত করিয়া লইতেন।

অবশেষে ৬ই নবেম্বর (১৯১১) প্রভাতের সেই মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল, যে মুহূর্ত্তে অমরাত্মার পরব্রহ্মে চিরবিশ্রাম লাভ হইল; এবং তাঁহার অগ্রগামী অদেহী শুদ্ধাত্মা বন্ধুগণ তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া লইলেন। তাঁহার পরলোক গমন সংবাদ শুনিয়া দেহী বন্ধুগণের অনেকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন উহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি;—

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়—"তিনি আমাদের মধ্যে একজন সাধু পুরুষ ছিলেন। তাঁহাকে যৌবনের প্রথম হইতে দেখিয়া আসিয়াছি। এরূপ নির্ম্মল-চরিত্র, ঈশ্বরপ্রেমিক মানুষ কম দেখিয়াছি। তিনি যে অমরধামে অমরগণের মধ্যে মিলিয়া মায়ের ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়াছেন তাহাতে কি সন্দেহ আছে ?"

ময়মনসিংহের অমরচন্দ্র দত্ত মহাশয়—"তিনি ব্রাহ্মসমাজে একজন বরণীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠার এক অপূর্ব্ব আকর্ষণ ছিল। তিনি এখানে থাকিতে যখন তন্ময় হইয়া বেদ হইতে উষার বর্ণনা পড়িতে পড়িতে ব্রহ্মের ব্যাখ্যা করিতেন আমরা তখন তাহা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনিয়া কৃতার্থ হইতাম। তাঁহার সুমিষ্ট কথাগুলি এখনও আমার কাণে বাজিতেছে। তিনি ইহলোকে ব্রহ্মে বাস করিতেন, পরলোকেও ব্রহ্মে স্থিতি করিতেছেন।"

ভাগলপুরের শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়—"আমরা আমাদের এমন একজন সাধু পুরুষকে হারাইয়াছি যিনি ব্রাহ্মসমাজের একজন শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। ইহাতে আমাদের অত্যন্ত ক্ষতি। কিন্তু আমাদের ইহাই সান্ত্বনার বিষয় যে

ইহা ঈশ্বরেরই ইচ্ছা এবং তিনিই আবার দুর্ব্বলতার স্থলে শক্তি, দুঃখের স্থলে আনন্দ আনিবেন।”

চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর গুপ্ত মহাশয়—“স্বর্গীয় বন্ধু একজন বিশ্বাসী ছিলেন। অনেক সময় তাঁহার সঙ্গে উপাসনা করিয়া ও আলাপ করিয়া সে বিশ্বাসের পরিচয় পাইয়া উপকৃত হইয়াছি। প্রভু তাঁহার বিশ্বাসী পুত্রকে অমৃত নিকেতনে স্থান দান করুন। রঙ্গপুরে অবস্থান কালে তাঁহার সঙ্গে বৈদিক প্রসঙ্গ করিয়া আমি বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলাম।”

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়—“তিনি আমাদের সমস্ত বিশ্বাসী মণ্ডলীর মধ্যে একজন বিশ্বাসী, পণ্ডিত ও উদারচেতা ছিলেন। তাঁহার চরিত্র আমাদের গৌরব করিবার বিষয় ছিল। মিষ্টভাষিতা, স্থিরতা, গভীর পাণ্ডিত্য ও চরিত্রের মাধুর্য্যে যেন শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। নববিধান মণ্ডলীর সহিত তাঁহার গভীর যোগ ছিল। তাঁহার অভাব সর্ব্বত্র সকলেই প্রত্যক্ষ করিবেন। পূর্ব্ববাঙ্গালার ব্রাহ্মমণ্ডলী যাঁহাদিগকে দেখাইয়া গৌরব করিতে পারিতাম তিনি তাঁহাদের অন্যতম অগ্রণী। জীবনের সর্ব্ব প্রকারের কর্ত্তব্য পালনেই তিনি আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তিনি এখন পৃথিবীর দুঃখ কষ্ট ছাড়াইয়া রোগমুক্ত হইয়া শান্তিময় পিতার নামে তাঁহার প্রেমময় ক্রোড়ে যেখানে ব্রহ্মানন্দ, মহর্ষি ও পিতামহ রামমোহন ও আরও কত সমবিশ্বাসী ভাই ভগিনী রহিয়াছেন তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন”।

ঢাকার শ্রীযুক্ত চণ্ডীকিশোর কুশারী মহাশয়—“তাঁহার মৃত্যুতে

ব্রাহ্মসমাজ একটী বহুমূল্য রত্ন হারাইয়াছেন। তাঁহার সংস্রবে যাঁহারা আসিতেন তাঁহারাই তাঁহার বিনয় এবং সৌজন্যের গুণে মুগ্ধ না হইয়া পারিতেন না। তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম্ম শাস্ত্রের গবেষণায় বিশেষভাবে নিযুক্ত থাকিয়া অনেক মূল্যবান সত্য প্রচারিত করিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে লোক দেখান ভাব খুব কম ছিল, ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার গভীর ভগবৎ প্রেম, লোকের নিকট প্রকাশিত ছিল না, তিনি গোপনে তাঁহার প্রাণারামের সহিত সর্ব্বদা বিহার করিতেন।"

কুচবিহারের রাজমাতা শ্রীযুক্তা সুনীতি দেবী—"সেই সুখময় ভারতাশ্রমে হাস্যধ্বনিতে আনন্দময়ীর পূজা হইয়াছিল, আজ শোকের অশ্রু ফেলিয়া শান্তিস্বরূপিণীর চরণ আমরা ধৌত করিতেছি। এমন শোভাসুখময় পৃথিবীতে কেন যে এমন শোক-আঁধার জানিনা। সকলই সেই বিশ্বজননীর লীলা অভিনয়। আর কত দূর সেই মধুপুর, আছি আশাপথ চেয়ে তৃষিত নয়নে।"

গিরিডির শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত মহাশয়—"তিনি আমাকে নানা রকমে সাহায্য করিয়াছিলেন। আমার প্রতি তাঁহার স্নেহ ছিল। আমি যখন ঢাকায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে আসি তখন আমার খরচের জন্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের হস্তে দুইশত টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। এজন্য আমি চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। তাঁহার পাণ্ডিত্য, নানা বিষয়ে গভীর জ্ঞান, তৎসঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি

ভক্তি, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ভালবাসা দেখিয়া আমি তাঁহাকে ভক্তি করিতাম। তিনি সময় সময় আমাকে পত্রাদি লিখিতেন।"

হাজারি বাগের শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়—"তাঁহার মত মানব জগতে অতি বিরল। আমি ত দেখি নাই। তাঁহার অমায়িক ভাব, ধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা, জ্ঞানের স্পৃহা, নরসেবার জন্য আগ্রহ সমুদয়ই অতুলনীয়। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। জীবনকে কৃতার্থ মনে করিয়াছি। কত দিনই না তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্ম. শাস্ত্র ও দর্শন লইয়া আলোচনা করিয়াছি। তিনি নিজ গুণে উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু পদের জন্য যে মান অভিমান তাহা তাঁহাকে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার সঙ্গে এক বিশেষ সম্বন্ধ, ধর্ম্মের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। এই পৃথিবীতে তাঁহাকে আর পাইব না। আপনি পিতৃহারা হইয়াছেন, আমাদিগেরও তিনি অতি আপনার জন ছিলেন, অতি নিকট আত্মীয় ছিলেন।"

শ্রীযুক্তা হেমলতা চন্দ :—"তিনি যে কি ভাল ছিলেন কথা আমার চিরদিন মনে থাকিবে। আমাদের মত গরীব লোককে তিনি কত ভাল বাসিতেন, কত ভাল ব্যবহার করেছেন কখনও ভুলিব না। তাঁর পবিত্র মধুর চরিত্র এ সংসারে অনেক লোকের আদর্শ হইতে পারে। এমন সদা প্রফুল্ল ও প্রসন্নমূর্ত্তি আর দেখিতে পাই নাই।"

অম্বিকাচরণের বার্ষিক শ্রাদ্ধবাসরে লিখিত পত্নীর কতিপয় প্রার্থনা উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থের উপসংহার করিতেছি।

(১)

দয়াময়ী মা! তোমার অসীম দয়ায় যাঁকে আমার জীবনের সঙ্গী করে দিয়েছিলে, ৩৫ বৎসর যাঁকে পেয়ে কত সুখ, কত আনন্দ পেয়েছি, আজ একবৎসর তাঁকে তুমি নিজ ক্রোড়ে স্থান দিয়াছ। দুজনে একসঙ্গে তোমার নাম ক'রে কত সুখী হয়েছি। যাঁর সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না, তাঁকে তুমি এত নিকটের করেছিলে, কত শক্ত ক'রে তাঁর সঙ্গে বেঁধেছিলে, তুমি সবই জান। তুমি এত করে বেঁধে আবার ছেঁড় কেন? তোমার এ রহস্য যে বুঝ্‌তে পারি না। তুমি কি এ বন্ধন ছিন্ন করিলে, না আরও শক্ত ক'রে বাঁধিলে? তাঁর শরীর তুমি নষ্ট ক'রে দিয়াছ বটে, কিন্তু আত্মার বন্ধন যে আরও দৃঢ় ক'রে দিলে। যে কয়টা দিন আমাকে পৃথিবীতে রাখ্‌তে চাও রাখ। তোমার ইচ্ছায় যে দিন তোমার অমৃতধামে চলে যাব, সে দিন তোমার কোলে তোমার সন্তানকে দেখে আমার কত আনন্দ, কত সুখ হবে। সেইদিনের অপেক্ষা ক'রে আছি। তুমি মানুষকে এত প্রেম, এত ভালবাসা দিলে কেন মা? শুধু কি কষ্ট দিবার জন্য? তা ত বল্‌তে ইচ্ছা হয় না মা! তুমি আমাদের জন্য তোমার স্বর্গ রাজ্যে কত সুখ, কত শান্তি সঞ্চয় করে রেখেছ, সেই আশায় বুক বেঁধে থাকি মা। একদিন দুজনে মিলে কত আনন্দাশ্রু দিয়ে তোমার চরণ ধৌত করেছি, আজ এই দুঃসহ শোকাশ্রু দিয়ে তোমার চরণ ধৌত করি।

হে আমার স্বর্গস্থ প্রিয়তম স্বামী-দেবতা! আজ এক বৎসর তুমি আমাকে ছেড়ে চ'লে গিয়াছ। তুমি দেহে থাকৃতে একদিনের বিচ্ছেদ্ অসহ্য হইত। একদণ্ড তুমি আমাকে না দেখ্‌লে ডেকে ডেকে অস্থির করতে। এই দীর্ঘ দুঃখের এক বৎসর চলে গেল। এরূপ কয় বৎসর চলে যাবে দয়াময় পিতাই জানেন। আজ তুমি অদেহী, আমি দেহী। আমার এ শোকাশ্রু কি তোমার নিকট পৌঁছাইতেছে? তুমি কি এখনো আমাকে তেম্নি ক'রে ডাক? তুমি আমার জন্য প্রার্থনা করিও। আমার শেষের দিনে তুমি আমাকে ডাকিয়া লইও। যেন সেখানে দুজনে মিলে পিতার পদসেবা ক'রে সুখী হ'তে পারি। তুমি আমাদের শুভ মিলনের প্রারম্ভেই যে সব সার সত্য কথা পত্রে লিখেছিলে আজ আমাদের সেই কথাগুলি স্মরণ করিবার দিন। তুমি লিখেছিলে—"এক এক সময়ে ভাবি তিন মিনিটে কত ঘটনা ঘটিতে পারে—এক দুই তিন করিয়া যে ৯০ দিন যাইয়া আশা পূর্ণ হইবে তার সম্ভাবনা কি? আর যদি এখনি পৃথিবীর নিকটে বিদায় লইতে হয়, আশা কোথায় থাকিবে? Vanity of vanities, all is vanity অসারের অসার সকলি অসার। এমন যদি কিছু না পাওয়া যায়, যাতে মৃত্যুকে জয় করিতে পারি তবে সকলি অসার। এ পৃথিবীতে মানুষের জীবন অকূল সমুদ্রে একটী ক্ষুদ্র তরঙ্গের ন্যায় মুহূর্ত্তকাল মস্তক উত্তোলন করিয়া অনন্ত জলরাশিতে মিশিয়া যায়। দুই দিনের গর্ব্ব, দুইদিনের উৎসাহ, উদ্যম দুইদিনের প্রেম ও ভালবাসা। এ

মুহূর্ত্তে যদি আমি মরি তুমি আমার কেহ নও, আমি তোমার কেহ নই। দুই দিনের শোক, সব সুখের পরিণাম, বিস্মৃতি-সাগরে সব আশার বিসর্জ্জন। হায়! ভাবিলে শুষ্ককণ্ঠ হইতে হয়, সন্ন্যাসী হইতে হয়। তখন প্রার্থনা করি "না ঈশ্বর, দুইদিনের বস্তু চাই না, যদি চিরদিনের কিছু তোমার ভাণ্ডারে থাকে, তোমার দুঃখী পুত্র, দুঃখিনী কন্যাকে প্রদান কর। আমরা সুখে উৎসাহে চিরদিন তোমার পদ সেবা করিব।"

তোমার আর এক পত্রে লিখেছিলে—"পৃথিবীতে কষ্ট যন্ত্রণা অনেক আছে। তবে যদি দুই হৃদয় মিলিত হইয়া পিতার চরণে পতিত হইতে পারি সব দুঃখ যাইবে। তবে এ পৃথিবীতে সুখের আশা করিও না। মনে মনে সেই দিনের ছবি হৃদয়ক্ষেত্রে চিত্রিত কর যে দিন এ পৃথিবীর কষ্ট যন্ত্রণা অতিক্রম করিয়া পরলোকে পিতার শান্তি নিকেতনে দুই জনে একত্র হইব। যে দিন পরলোকগত আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধবকে প্রেমালিঙ্গন করিব। বুঝিলে, এ পৃথিবীতে ভালবাসাকে বদ্ধ করিলে প্রেমের সুন্দর মনোহর মূর্ত্তি দেখা যায় না। এখানে কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যে ভয়ে ভয়ে ভালবাসা, সেখানে চিরশান্তি, চিরপ্রেম। মনে কি করিয়াছ তোমার স্নেহময় জনক পরলোকে যাইয়া তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন? যদি তাহা হইত তোমার প্রাণ এখনও তাঁর জন্য কাঁদে কেন? যে ভালবাসা মৃত্যুতে শেষ হয় সে ভালবাসা চাই না। হৃদয় তা'তে তৃপ্ত হয় না। এখানে ভালবাসার শেষ নহে কিন্তু আরম্ভ। এখানে নিরবচ্ছিন্ন ভালবাসিতে পারিব না।

কতবার রাগও করি কিন্তু ক্রমে আশা করি প্রকৃত ভালবাসা কাহাকে বলে, শিখিব। মৃত্যু ভালবাসার শেষ নহে কিন্তু পরীক্ষা।"

তুমি যখন আমাকে এ সব কথা লিখেছিলে তখন আমি বালিকা বলিলেই হয়। এ সব কথার মর্ম্ম তখন আমি গ্রহণ করিতে সক্ষম ছিলাম না তাহাও তুমি জান। ৩৫ বৎসর পরে ভগবান আমাদের সেই পরীক্ষায় ফেলিয়াছেন। আজ এই ৩৫ বৎ-সরের যে কত মূল্য তাহা বুঝিতেছি। ৩৫ বৎসর তোমাকে পৃথিবীতে পেয়ে যে কত সুখী হয়েছিলাম সেজন্য আজ দয়াময় পিতাকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ দিই। এখন আমাদের সেই অপেক্ষা করিবার দিন; কত দিন অপেক্ষা করিতে হইবে যিনি সকল সুখের আধার তিনিই জানেন।

তুমি যখন আমাকে মনে মনে সেদিনের ছবি হৃদয় ক্ষেত্রে চিত্রিত করিতে অনুরোধ করেছিলে, তখন আমি নিতান্ত নির্ব্বোধ বালিকা ছিলাম। এতদিন পরে তোমার সেই অমূল্য রত্নের মত কথাগুলি আমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। তুমি আমার জন্য পার্থিব যে ধন সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছ তাহা অপেক্ষা তোমার এই সত্য উপদেশগুলি আমার নিকট এখন শত সহস্র গুণে অধিক মূল্যবান। তুমি যদি আমাকে এই আশার কথাগুলি না লিখে যেতে আমার দশা কি হ'ত জানি না। আমি কি নিয়ে থাক্‌তাম জানি না। তোমার অমূল্য পত্রগুলি এখন আমার বাকী জীবনের সম্বল। এখন তুমি সে দেশে আমি এদেশে; কিন্তু আমাদের

আত্মা ত এক জায়গায়। এস দুজনে মিলে দয়াময় পিতাকে প্রণাম করি। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

দয়াময়! এ পরীক্ষার দিনে তুমি আমাদের মাঝখানে থাকিও। মিলনের দিনেও তুমিই, এ বিচ্ছেদের দিনেও তুমিই কাছে থেকো। কবে তোমার শান্তিধামে দুজনে তোমার চরণে মিলিত হ'য়ে সুখী হ'ব। তুমি আমাদের আশীর্ব্বাদ কর।

(২)

তাঁর সঙ্গে ব'সে যখন তোমার নাম কর্‌তাম কত সুখ, কত আনন্দ হ'ত। এখন কি মা একলা তোমায় ডাকিব? এখন কি সেই পবিত্র অমরাত্মা আমাকে তোমার দিকে টেনে নিবেন না? তাঁর আত্মা কি এখন আমার সঙ্গে নাই? এ পৃথিবীতে যে বড় ভ হয় একলা থাকিতে। একলা থাকা যায় না বলেই ত তুমি সঙ্গী দাও। দুজনকে একত্র করেছিলে কি অভিপ্রায়ে ব'লে দাও মা! সংসারে দুদিনের খেলা খেলিতে কি? তা'ত নয়। যখন একত্র ক'রেছিলে তখনই ত তোমার সন্তান তোমার কাছে প্রার্থনা ক'রেছিলেন—"ভালবাসা চাইনা মা, যাহা চিরকাল থাকে এমন যদি তোমার ভাণ্ডারে কিছু থাকে তোমার দুঃখী পুত্র ও দুঃখিনী কন্যাকে প্রদান কর।" আজ মা! তোমার ভক্ত সন্তানের ৩৭ বৎসর পূর্ব্বের প্রার্থনা পূর্ণ কর। সংসারে ত আমাকে কত সুখী ক'রেছিলে, এখন এই বিষম সঙ্কটের সময়ে আমার ভগ্নপ্রাণে আশার কথা বলে দাও মা! অদেহী ও দেহী কি ক'রে একত্র হ'তে পারে আজ বলে দাও। তোমার দয়ায়

আজ এই তুর্ব্বল অসহায় দেহী আত্মা সেই অদেহী আত্মার সাহায্য ভিক্ষা চাহিতেছে।

মা! নিয়ে চল সেখানে, যেখানে তোমার সন্তান গিয়াছেন। পরকালে গিয়ে প্রিয়জনদের সঙ্গে তোমায় ডাকি। মা! তোমার প্রিয়সন্তান যে এ পৃথিবীতে থাকিতেই তোমাকে ভাল ক'রে চিনে-ছিলেন। পৃথিবীর তু'দিনের তুচ্ছ ধন, মান, সম্ভ্রম, আমোদ আহ্লাদ যে তাঁকে কখনই সুখ শান্তি দিতে পারে নাই। তিনি যতদিন পৃথিবীতে ছিলেন মৃত্যুচিন্তা, পরলোকচিন্তা করিতেই ভাল বাসিতেন। মা অন্তর্য্যামিনি! তুমি ত সব জান। রোগের দারুণ যন্ত্রণা তাঁকে একদিনের জন্যও তোমার চরণ হ'তে বিচলিত করিতে পারে নাই। আজ তিনি তাঁহার চিরবাঞ্ছিত শান্তিপ্রদ তোমার সুশীতল অভয়পদ লাভ ক'রে চিরসুখ, চিরশান্তি লাভ করেছেন। জননি তোমার কাছে আমি তাঁর জন্য কি প্রার্থনা করিব? তোমার ভক্ত সন্তান তোমাকে পাইয়া আজ কত সুখী, তুমি দিন দিন তাঁহাকে আরও অধিকতর সুখ শান্তি দাও।

হে আমার প্রাণের প্রিয়তম স্বামী দেবতা! সেই যে তোমার সঙ্গে মিলনের আরম্ভ হইতেই ৩৫ বৎসর ধরিয়া, প্রতিদিন মৃত্যুর কথা বলিয়া আমাকে সেই দিনের জন্য প্রস্তুত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলে, নির্ব্বোধ আমি তোমার ও কথাগুলি শুনিতে ভালবাসিতাম না। তুমি মৃত্যুর কথা লিখিয়া কোন পত্রে এইরূপ লিখেছিলে—"আমার বৃথা বলা।" হায়! আমি নির্ব্বোধ! যদি তোমার মত প্রস্তুত হইতে পারিতাম, এত কষ্ট কি পাইতাম?

ক্ষমা কর, অপরাধ অনেক করেছি তোমার চরণে, তার মধ্যে একটি অপরাধ—তুমি মৃত্যু স্মরণ করাইয়া দিয়া আমাকে প্রস্তুত করিতে চাহিতে, কিন্তু নির্ব্বোধ আমি তোমার ওকথা শুনিতে প্রস্তুত ছিলাম না। যত দিন যাইতেছে ততই অপরাধ স্মরণ হইতেছে। আজ আমার সকল প্রকার অপরাধ ও ক্রটী ক্ষমা কর।

তোমার মুখে শুনেছি, বাল্যকাল হইতেই তোমাকে কোন সুখ শান্তি দিতে পারে নাই—চিরকালই তুমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, স্বর্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত ছিলে এবং ইহকাল ও পরকাল—জীবন ও মৃত্যু একীভূত করিয়া চিন্তা করিতে তুমি ভালবাসিতে।

তুমি লিখেছিলে—"যে প্রেম শান্ত ও মধুর, যাহার উপর সময় ও স্থানের আধিপত্য নাই তাহা আমাদের হউক। তুমি মৃত্যু চিন্তা পরিত্যাগ করিতে চাও, আমি সে বিষয়ে খুব চিন্তা করিতে চাই, কারণ মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী—তবে আমি মৃত্যুকে পৃথক্ না করিয়া ইহার সহিত একীভূত করিতে চাই। এইরূপভাবে চিন্তা না করিলে আমার মনে সুখ হয় না—আমার উৎসাহ চলিয়া যায়। এই সমুদায় চিন্তা বোধ হয় তোমার ভাল লাগে না।"

তুমি এত করিয়া আমাদের শুভমিলনের প্রারম্ভ হইতেই, আমাকে মৃত্যুর জন্য—অর্থাৎ যে কয় বৎসর কেহ এপারে কেহ ওপারে থাকিব সেই দুর্দ্দিনের জন্য আমাকে প্রস্তুত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলে। হায়! কি নির্ব্বোধ আমি তখন এই সব কথার মূল্য কিছুই গ্রহণ করিতে পারি নাই।

এই বিষম পরীক্ষার দিনে তুমি আমার সহায় হও। তুমি সাহায্য না করিলে যে আমার চলে না। আমি যে বাকী জীবনে মার ইচ্ছা পালন করিতে পারি ও দেহান্তে তোমার সহিত মিলিত হইয়া মার পদসেবা ক'রে সুখী হইতে পারি।

মা! তোমার লীলা বুঝে সাধ্য কার? এ কি রহস্য তুমি করেছ বুঝাইয়া দাও? কেহ এপারে কেহ ওপারে, ডাকাডাকি করে সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। কিন্তু আত্মায় আত্মায় যে সূত্র দিয়ে বেঁধে রেখেছ, তাতে যে ক্রমাগতই টান পড়ে। আজ তোমার ভক্তসন্তানের প্রার্থনাই আমার প্রার্থনা। যতদিন বলিবে তুমি, সেই সুখের দিনের জন্য অপেক্ষা করিব।

(৩)

কত উপায়ে তুমি আমাকে শিক্ষা দিয়ে বলে গেলে, "এ সংসার অনিত্য, দুদিনের, একটি জলবুদ্বুদের ন্যায়। এখানে প্রেমের আরম্ভ মাত্র, কিন্তু চিরপ্রেম চিরশান্তি পিতার ঐ চরণতলে, শান্তিনিকেতনে।"

একটি জর্ম্মণ কবি তাঁহার মৃত পত্নীর সমাধিতে বসিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, তুমি তাহা ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিয়া আমাকে কখন উপহার দিয়াছিলে, আমার একটুও স্মরণ নাই। তুমি যেটি আমাকে উপহার দিয়াছিলে তাহা এই—

কবি লিখেছেন—"কোন এক সময়ে আমি মর্ম্মভেদী অশ্রুজল পরিত্যাগ করিতেছিলাম, অনন্ত দুঃখসাগরে আমার জীবনের আশা ভরসা নিমজ্জিত হইয়াছিল। যে অন্ধকারময় ক্ষুদ্র সমাধিক্ষেত্রে

আমার জীবনের চিত্র পুত্তলিকা লুক্কায়িত, আমি তাহার পার্শ্বে একাকী, ভগ্নহৃদয়, শক্তিহীন। জীবন একমাত্র চিন্তায় আন্দোলিত—সে দুঃখের চিন্তা। আশ্রয়ের জন্য এক একবার ব্যাকুল ভাবে উৰ্দ্ধনেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেছি। অগ্রসর হইতে অক্ষম, প্রতিগমনে অসমর্থ, কিন্তু এক বিনশ্বর বিগতজীবনে আমার হৃদয় মন দৃঢ়বদ্ধ। দেখিতে দেখিতে মধ্যাহ্নকালের পরিষ্কার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, শীতল বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে জন্ম, জরা, মৃত্যু আমার চক্ষু হইতে দূরে প্রস্থান করিল, পৃথিবীর সমস্ত সুখসম্পদ্ আকাশে মিশিয়া গেল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়বেদনারও শেষ হইল। অনন্ত আকাশে আমার আত্মা বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। ক্ষুদ্র সমাধিক্ষেত্র ধূলিকণা রূপে নভোমণ্ডলে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল এবং সেই আকাশে আমার মৃত বন্ধুর স্বচ্ছদেহ দেখিতে পাইলাম। তাঁহার চক্ষুর ভিতরে অনন্ত কাল ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। আমি প্রেমোন্মত্ত হইয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিলাম। আমার অশ্রুজল দরবিগলিতধারায় পতিত হইয়া দুই হস্তকে কুসুমের হারে বদ্ধ করিল। গত ঘটনা, ভবিষ্যৎ চিন্তা চলিয়া গেল। "কোথায় আমরা প্রিয় মেটিলডা? পিতার শান্তিনিকেতনে। আমরা কি একত্র অবস্থান করিতে পাইব? চির দিনের জন্য।" এই বলিয়া মেটিলডা আমার কর্ণে মধুময় কি একটী বাক্য বলিলেন। আমার মুখ প্রফুল্ল হইল।"

ইহলোকে সুখসম্পদের মধ্যে থাকিয়াও তুমি ক্রমাগত

পরলোকের তত্ত্ব আমার চখের সম্মুখে ধরিয়া আমার ঘুমঘোর ভাঙ্গাইতে কত চেষ্টা করিয়াছ। আজ কি তুমি আমার মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত নও? তুমি কি বলছ না বিনশ্বর জীবনের জন্য চিন্তিত, শোকগ্রস্ত হও কেন? অবিনশ্বর, অনন্ত জীবনের জন্য প্রস্তুত হও, দুঃখের চিন্তা ভুলে যাও। সম্মুখে অনন্ত মিলন, অনন্ত সুখ।

জননী! একত্র করেছিলে তুমি। আজ প্রকাশিত হ'য়ে তোমার দুর্ব্বল কন্যাকে অভয় প্রদান কর। বল শান্তিধাম দূরে নয়— আমারি সম্মুখে। আমার মুখ প্রফুল্ল হ'য়ে যাক্। আশা ও ভক্তিভরে তোমার চরণে বার বার প্রণাম করি।

(৪)

কেহ ইহলোকে, কেহ পরলোকে—বড় দুর্গম, বড় দূর বলে মনে হয়। কিন্তু মা! তুমি ইহলোকে, তুমিই পরলোকে। তোমার একই ক্রোড়ে। তবে কেন আপনাকে নিরাশ্রয় বলে মনে করি? যে বিচ্ছেদ অনন্তকালের মিলনের জন্য প্রাণকে ব্যাকুল করিতেছে, তাহাতে যেন ভয় না পাই। এ দুঃখময় সংসারের কষ্ট যন্ত্রণার সময়ে তোমার মঙ্গল হস্ত দেখিতে দাও। দুঃখ দুর্দ্দিনের ঘন অন্ধকারে তোমার দয়াময় নামে কতবার অবিশ্বাস আনিয়া অপরাধ করেছি; আর যেন না করি। তুমি তোমার পুত্রকে নির্ব্বাণের পথ দেখাইয়াছিলে, আমাকে কি সে পথ দেখাবে না? তিনি সংসারের দুঃখ বিপদে অটল ভাবে তোমারই মুখপানে চাহিয়া থাকিতেন, তোমার দুর্ব্বল

কন্যাকে সে শক্তি দাও। তিনি যেমন তোমাকে লাভ করে' সুখী হয়েছিলেন, আজ আমাকে তুমি সেই ভিক্ষা দাও। আজ বল, আবার দুটী আত্মা তোমারই গৃহে তোমার পূজা করিয়া চিরদিনের জন্য সুখী হইবে।

(৫)

হে আমার প্রাণের প্রিয়তম স্বামী দেবতা! আজ ৭ বৎসর তুমি অদেহী আমি দেহি। তুমি দেহে থাকিতে ভাবিতাম, তুমি যদি আগে চলে যাও, আমার এ জীবন ধারণ অসম্ভব হবে। সকল অসম্ভব সম্ভব করে দিলেন, আমাদের দয়াল পিতা, দয়াময়ী মা। অন্ধকার দেখেছিলাম গৃহ। তোমাশূন্য গৃহে কি থাকতে পারিব? কিন্তু অনুভব করিতেছি, তুমি এ গৃহ ছেড়ে যাও নাই। এ হৃদয় জুড়ে রয়েছ। যেখানেই যাই, তুমি আমার সঙ্গে আছ। এই যে বেণারসে গেলাম, সেখানেও তুমি আমার সঙ্গে গেলে। সারনাথে, তোমার প্রিয় ভক্ত বুদ্ধদেবের জন্ম হইতে স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত যে মূর্ত্তিগুলি দেখিলাম, তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে তোমাকে দেখিতে পাইলাম। তুমিও যে আজ স্বর্গধামে দেবতার সঙ্গে মিলে আনন্দ করিতেছ, তোমার প্রিয় বুদ্ধদেবের সঙ্গে মিশে সুখে আছ। আর আমাকে কি ভুলেছ? না, অসম্ভব! তুমি যদি তোমার প্রেমবারি সিঞ্চন না করিতে, আমি কখনই বাঁচিতাম না। তোমার ঐ প্রেমেই আমার মৃতপ্রাণে জীবন সঞ্চারিত করিতেছে। ধন্য পিতা তাঁর নামই জয়যুক্ত হউক।

সম্পূর্ণ।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর

জীবনবৃত্তান্ত।

শ্রীবঙ্কবিহারী কর প্রণীত।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—"স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের যে জীবনী আপনি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে উপাদেয় হইয়াছে। তাহাতে এই সাধক মহাত্মার পরিচয়টী অতি উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। এই চরিত গ্রন্থ রচনায় আপনারও যথেষ্ট নিষ্ঠা, নৈপুণ্য ও সংযম প্রকাশ পাইয়াছে। পুস্তকটির মধ্যে কোথাও আপনি সাম্প্রদায়িক উগ্রতাকে প্রশ্রয় দেন নাই, অথচ সাম্প্রদায়িক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যদিয়া যে পবিত্র জীবনস্রোত সমুদ্রসঙ্গমে যাত্রা করিয়াছে তাহার ইতিহাস আপনি অসঙ্কোচে সম্পূর্ণভাবে বিবৃত করিয়াছেন ইহা দেখিয়া আমি আনন্দ অনুভব করিয়াছি। * * আমি আজ কাল লেখা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছি, নতুবা এরূপ গ্রন্থের উপযুক্ত সমালোচনা আমি স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়াই করিতাম।"
